বর্ণমালাতত্ত্ব
ও বিবিধ প্রবন্ধ

সুকুমার রায়

বর্ণমালাতত্ত্ব

ও বিবিধ প্রবন্ধ

সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
পীযূষ মিত্র
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
প্রচ্ছদপট ও আর্টপ্লেট
গসেন এন্ড কোম্পানি
৭।১ গ্রান্ট লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট

ব্রাঙ্কুসি ও পিকাসোর
ছবিব প্রতিলিপি
নিউ ইয়র্ক
মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট
প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে প্রকাশিত

দাম আড়াই টাকা

সূচীপত্র

রচনাকাল ১৩১৭-১৩৩০



বর্ণমালাতত্ত্ব । সমালোচনা । সম্পাদকের দশা

বর্ণমালাতত্ত্ব

পড় বিজ্ঞান, হবে দিকজ্ঞান, ঘুচিবে পথের ধাঁধা,
দেখিবে গুণিয়া, এ দীন দুনিয়া, নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা।
কহে পণ্ডিতে, জড়-সন্ধিতে, বস্তু-পিণ্ড-ফাঁকে,
অনু-অবকাশে, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, আকাশ লুকায়ে থাকে।
হেথা হোথা সেথা জড়ের পিণ্ড, আকাশ-প্রলেপে ঢাকা,
নয়কো কেবল নীরেট গাঁথন, নয়কো কেবলি ফাঁকা।
জড়ের বাঁধন বদ্ধ আকাশে, আকাশ-বাঁধন জড়ে—
পৃথিবী জুড়িয়া সাগর যেমন, প্রাণটি যেমন ধড়ে।
'ইথার'-পাথারে, তড়িত-বিকারে, জড়ের জীবন দোলে,
বিশ্ব-মোহের সুপ্তি ভাঙিছে সৃষ্টির কলরোলে॥

শুন শুন শুন তত্ত্ব নূতন, কে যেন স্বপন দিলা,
ভাষা-প্রাঙ্গণে স্বরে-ব্যঞ্জনে ছন্দ করেন লীলা।
স্বর-ব্যঞ্জন যেন দেহ-মন, জড়েতে চেতন বাণী,
এক বিনা আরে থাকিতে না পারে, প্রাণ-হারা যেন প্রাণী।
দোঁহে ছাড়ি দোঁহে, মূক রহে মোহে, ভাষার বারতা ভুলি
স্বরের নিশাসে, 'আহা' 'উহু' ভাষে, ব্যঞ্জনে নাহি বুলি।
স্তিমিত-চেতন জগৎ যখন, মগন আদিম ধূমে,
অঘোর-তিমির, স্তব্ধ বধির, স্বপ্ন-মদির ঘুমে;
আকুলগন্ধে আকাশ-কুসুম উদাসে সকল দিশি,
অন্ধ জড়ের বিজন আড়ালে কি যেন রয়েছে মিশি!
জাগে হাহুতাশ, স্বরের বাতাস, জড়ের বাঁধন ছিঁড়ি
ফিরে দিশাহারা, কোথা ধ্রুবতারা, কোথা স্বর্গের সিঁড়ি!
অ আ ই ঈ উ ঊ, হা হা হি হি হু হু, হাল্কা শীতের হাওয়া,
অলখচরণ প্রেতের চলন, নিঃশ্বাসে আসা যাওয়া,
খেলে কি না খেলে, ছায়ার আঙুলে, বাতাসে বাজায় বীণা,

আলস-বিভোর, আফিঙের ঘোর, বস্তুতন্ত্রহীনা।
ভাবে কূল নাই, শুধু ভেসে যাই, যুগে যুগে চিরদিন,
কাল হতে কালে, আপনার তালে, অনাহত বাধাহীন॥

অকূল অতলে, অন্ধ অচলে, অস্ফুট অমানিশি,
অরূপ আঁধারে, আঁখি-অগোচরে, অনন্তে-অনন্তে মিশি।

আসে যায় আসে, অবশ আয়াসে, আবেগে আকুল প্রাণে,
অতি আনমনা, করে আনাগোনা, অচেনা অজানা টানে,
আধো-আধো ভাষা, আলেয়ার আসা, আপনি আপন-হারা
আদিম আলোতে, আবছায়া পথে, আকাশ-গঙ্গা-ধারা।

ইচ্ছা-বিকল ইন্দ্রিয়দল, জড়িত ইন্দ্রজালে,
ইশারা আভাসে, ইঙ্গিতে ভাষে, রহ-রহ ইহকালে।

কেন ইতিউতি, উতলা আকুতি, উসখুস উঁকিঝুঁকি,
উড়ে উচাটন, উড়ু উড়ু মন, উদাসে ঊর্ধ্বমুখী।

হের একবার, সবি একাকার, একেরি এলাকা মাঝে
ঐ ওঠে শুনি, ওঙ্কার-ধ্বনি, একূলে ওকূলে বাজে॥

ওরে মিথ্যা এ আকাশ-চারণ, মিথ্যা তোদের খোঁজা,
স্বর্গ তোদের বস্তু সাধনে, বহিতে জড়ের বোঝা।
আকাশ-বিহনে বস্তু অচল, চলে না জড়ের চাকা,
আইল আকাশে ফোকলা বাতাস, কেবলি আওয়াজ ফাঁকা।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করনি, শাস্ত্র পড়নি দাদা—
জড়ের পিণ্ড আকাশে গুলিয়া, ঠাসিবে ভাষার কাদা!
শাস্ত্রবিধান কর প্রণিধান, ওরে উদাসীন অন্ধ,
ব্যঞ্জন-স্বরে, যেন হরি-হরে, কোথাও রবে না দ্বন্দ্ব।
মরমে-মরমে সরম পরশে বাতাস লাগিলে হাড়ে,
ভাষার প্রবাহে, পুলক-কম্পে, জড়ের জড়তা ছাড়ে॥

(তবে) আয় নেমে আয়, জড়ের সভায়, জীবন-মরণ-দোলে,
আয় নেমে আয়, ধরণীধূলায় কীর্তন কলরোলে।
আয় নেমে আয় কণ্ঠ বর্ণে, কাকুতি করিছে সবে,
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে, প্রভাতে কাকের রবে॥

নমো-নমো নমঃ, সৃষ্টি প্রথম, কারণ-জলধি জলে
স্তব্ধ তিমিরে প্রথম কাকলী, প্রথম কৌতূহলে;
আদিম তমসে প্রথম বর্ণ, কনক-কিরণ-মালা;
প্রথম-ক্ষুধিত বিশ্ব-জঠরে প্রথম প্রশ্ন-জ্বালা।

কহে 'কই, কেগো, কোথায় কবেগো, কেন বা কাহারে ডাকি?'
কহে 'কহ-কহ, কেন অহরহ, কালের কবলে থাকি?'
কহে কানে-কানে, করুণ কূজনে, কল-কল কত ভাষে,
কহে কোলাহলে, কলহ-কুহরে, কাষ্ঠ-কঠোর-হাসে।
কহে কটমট, কথা কাটা-কাটা—'কেও-কেটা কহ কারে?
কাহার কদর কোকিল-কণ্ঠে, কুন্দ-কুসুম-হারে?
কবি-কল্পনে, কাব্যে-কলায়, কাহারে করিছ সেবা?
কুবের-কেতনে, কুঞ্জ-কাননে, কাঙাল কুটিরে কেবা?
কায়দা-কানুনে, কার্যে-কারণে, কীর্তিকলাপ-মূলে,
কেতাবে, কোরাণে, কাগজে-কলমে, কাঁদায়ে কেরানীকুলে?
কথা কাঁড়ি-কাঁড়ি, কত কানা কড়ি, কাজে কচু কাঁচকলা,
কভু কাছাকোছা, কোর্তা কলার, কভু কৌপীন ঝোলা।
কুটিল কৃপণে, কুৎসা-কথনে, কুলীন কন্যাদায়ে,

কর্মক্লান্ত, কালিমা-কান্ত, ক্লিষ্ট কাতর কায়ে।
কলে কৌশলে, কপট কোঁদলে, কঠিনে কোমলে মিঠে—
ক্লেদ-কুৎসিত, কুষ্ঠ-কলুষ, কিলবিল কৃমি কীটে।'
'ক'-এর কাঁদনে, কাংস্য-ক্বণনে, বস্তু-চেতন জাগে,
অকাল-ক্ষুধিত-খাই-খাই-রবে, বিশ্বে তরাস লাগে।
আকাশ অবধি ঠেকিল জলধি, খেয়াল জেগেছে খ্যাপা!
কারে খেতে চায়, খুঁজে নাহি পায়, দেখ কি বিষম হ্যাঁপা!
(খালি) করতালে কভু কীর্তন খোলে? খোলে দাও চাঁটিপেটা!
নামাও আসরে 'ক'-এর দোসরে, 'খেঁদেলো খেঁদেলো খেটা।'

এখনো খোলেনি মুখের খোলস, এখনো খোলেনি আঁখি,
ক্ষণিক খেয়ালে পেখম ধরিয়া, কি খেলা খেলিল পাখি!
খোল খরতালে, খোলসা খেয়ালে, 'খোল খোল খোল' বলে,
শখের খাঁচার খিড়কী খুলিয়া, খঞ্জ খেয়াল চলে।
প্রখর-ক্ষুধিত তোখড় খেয়াল, খেপিয়া রুখিল ত্বরা,
চাখিয়া দেখিল, খাসা এ অখিল, খেয়াল-খচিত ধরা।
খুঁজি সুখে দুখে, খেয়ালের ভুলে, খেয়ালে নিরখি সবি,
খেলার খেয়ালে, নিখিল-খেয়াল লিখিল খেয়াল-ছবি।
খেয়ালের লীলা খদ্যোত-শিখা, খেয়াল খধূপ-ধূপে,
শিখী পাখা পরে, নিখুঁত আখরে, খচিত খেয়ালরূপে।
খোদার উপরে খোদকারী করে ওরে ও ক্ষিপ্ত-মতি,
কীলিয়ে অকালে কাঁঠাল পাকালে, আখেরে কি হবে গতি?
খেয়ে খুরো চাঁটি, খোল কহে খাঁটি, 'খাবি খাব, ক্ষতি নাই,'
খেয়ালের বাণী করে কানাকানি—'গতি নাই, গতি নাই।'

গতি কিসে হবে, চিন্তিয়া তবে, বচন শুনিনু খাসা,
পঞ্চ-কোষের প্রথম খোসাতে, অন্ন রয়েছে ঠাসা!
আত্মার মুখে আদিম-অন্ন, তাহে ব্যঞ্জনগুলি,
অনুরাগে লাগি, করে ভাগাভাগি, মুখে-মুখে দাও তুলি।

এত বলি ঠেলি আত্মারে তুলি, তত্ত্বের লগি ধরি,
খেয়ালের প্রাণী রহে চুপ মানি, বিস্ময়ে পেট ভরি।
কবে কেবা জানে, গতির গড়ানে, গোপন গোমুখী হতে
কোন ভগীরথে গলাল জগতে গতির গঙ্গা-স্রোতে।
দেখ আগাগোড়া, গণিতের গড়া, নিগূঢ় গণন সবি
গতির আবেগে, আগুয়ান বেগে, অগণিত গ্রহরবি।
গগনে-গগনে, গোধূলি-লগনে, মগন গভীর গানে,
করে গমগম, আগম নিগম, গুরুগম্ভীর ধ্যানে।
গিরি-গহ্বরে, অগাধ-সাগরে, গঞ্জে নগরে-গ্রামে,
গাঁজার গাজনে, গোষ্ঠে গহনে, গোকুলে গোলোকধামে॥

বিকল অঙ্গ, ভগ্নজঙ্ঘ, এ কোন্ পঙ্গু মুনি?
কেন ভাঙা ঠ্যাঙে ডাঙায় নামিল, বাঙালা মুলুকে শুনি?
রাঙা আঁখি জ্বলে, চাঙা হয়ে বলে, ডিঙাব সাগর গিরি,
কেন ঢঙ ধরি, ব্যাঙাচির মতো, লাঙুল জুড়িয়া ফিরি?

টলিল দুয়ার চিত্ত-গুহার, চকিতে চিচিংফাঁক
শুনি কলকল ছুটে কোলাহল, শুনি চল-চল ডাক।
চলে চটপট চকিত চরণ, চোঁচা চম্পট নৃত্যে,
চলচিত্রিত চিরচিন্তন, চলে চঞ্চল চিত্তে।
চলে চঞ্চলা চপল চমকে, চারু চৌচির বক্রে,
চলে চন্দ্রমা, চলে চরাচর, চড়ি চড়কের চক্রে।
চলে চকমকি চোখের চাহনে, চঞ্চরী-চল-ছন্দ,
চলে চীৎকার চাবুক চালনে, চপেট চাপড়ে চণ্ড।
চলে চুপি-চুপি চতুর চৌর, চৌদিকে চাহে ত্রস্ত,
চলে চূড়ামণি চর্বে চোষ্যে, চটি চৈতনে চোস্ত।
চিকন চাদর চিকুর চাঁচর, চোখা চালিয়াৎ চ্যাংড়া,
চলে চ্যাংব্যাং, চিতল কাতল, চলে চুনোপুটি ট্যাংরা॥

[অসমাপ্ত রচনা]

সমালোচনা

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'নিরঙ্কুশ' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

'গবদ্গীতার' গ্রন্থকার মেঘমালতীর কবি,
আজ এসেছেন কলকেতাতে পাঠাচ্ছি তাঁর ছবি।
আসছে মাসে 'নিরঙ্কুশে' ছাপিয়ে দিতে হবে,
এই অনুরোধ নাছোড়বান্দা করছি মোরা সবে।
সঙ্গে দিলাম সংক্ষেপেতে জীবনী তাঁর লিখে,
সবাই হবেন উপকৃত নূতন কথা শিখে।
আরও দিলাম এক পুঁটলী কাব্য তাঁরি লেখা
'কাকুতি' আর 'কৃষ্ণকাজল' 'কম্বু' 'তস্মরেখা,'
'প্রপঞ্চ' আর 'আহ্লাদিকা' 'মঞ্জী' 'মিহিদানা'
'ভৃঙ্গী' 'ভঙ্গী' ইত্যাদিতে মোদ্দা ঊনিশখানা।
করতে হবে সমালোচন বিশেষ দরদ করে—
আরেক কথা, ছবিখানার নিচের দিকে ফাঁকে,
'কিশোরী চাঁদ কাব্যকুলিশ' নামটি যেন থাকে।
আপনারাই তো দেশের শক্তি এবং জ্ঞানদাতা,
দেশের গতি, দেশের কণ্ঠ, জিহ্বা ঘিলু মাথা।
অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন মহাশয়দের কাছে,
ফিরাবেন না নিরাশ করে এই ভরসা আছে।

—শ্রীগৌরহরি আঢ্য

শ্রীযুক্ত গৌরহরি আঢ্য মহাশয় সমীপেষু—

আঢ্যি মশায়! হাড্ডি মোদের নয়কো তেমন শক্ত
এসব কাব্য হয় না হজম, মাথায় ওঠে রক্ত।
এমন রাবিশ গজায় কেন, মজায় কেন দেশটায়?
সস্তা হাটে নামটি কিনে পস্তাতে হয় শেষটায়।
আপনারা সব ধন্যি বলুন, কবির বাড়ুক পুণ্যি
মোদের কাছে এগ্‌জামিনে পেলেন তিনি শূন্যি!
—নিবেদক শ্রী'নিরঙ্কুশ' সম্পাদক

সম্পাদকের দশা

একদা নিশীথে এক সম্পাদক গোবেচারা।
পোঁটলা-পুঁটুলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া॥
অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনি সে।
জানে তাহা ভুক্তভোগী অপরে বুঝিবে কিসে?
লেখক পাঠক আদি সকলেরে দিয়া ফাঁকি।
বেচারী ভাবিল মনে—বিদেশে লুকায়ে থাকি॥
এদিকে তো ক্রমে-ক্রমে বৎসরেক হল শেষ।
নোটিশ পড়িল কত 'সম্পাদক নিরুদ্দেশ'॥
লেখক-পাঠকদল রুষিয়া কহিল তবে।
জ্যান্ত হোক মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে॥
বাহির হইল সবে শব্দ করি 'মার মার'।
দৈবের লিখন, হায়, খণ্ডাইতে সাধ্য কার॥
একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয়।
পড়িলেন ধরা—আহা দুরদৃষ্ট অতিশয়!

তার পরে কি ঘটিল কি করিল সম্পাদক।
সে সকল বিবরণে নাহি আবশ্যক॥
মোট কথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে।
বসিলেন আপনার প্রাচীন গদীতে এসে॥
(অর্থাৎ লেখকদল লাঠ্যৌষধি শাসনেতে।
বসায়েছে তারে পুনঃ সম্পাদকী আসনেতে॥)
ঘুচে গেছে বেচারীর খনিক সে শান্তি সুখ।
লেখকের তাড়া খেয়ে সদা তার শুষ্কমুখ॥
দিস্তা-দিস্তা গদ্য-পদ্য দর্শন সাহিত্য পড়ে।
পুনরায় বেচারীর নিত্যি-নিত্যি মাথা ধরে॥
লোলচর্ম অস্থিসার জীর্ণ বেশ রুক্ষ্ম কেশ।
মুহূর্ত সোয়াস্তি নাই—লাঞ্ছনার নাহি শেষ॥

২ ভাষার অত্যাচার । ক্যাবলের পত্র

ভাষার অত্যাচার

হাতের কাছেই যাহা থাকে, যাহাকে লইয়া অহরহ কারবার করিতে হয়, তাহার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে খুব একটা স্পষ্ট অনুভূতি আমাদের মধ্যে অনেক সময়েই দেখা যায় না। এই দেহটাকে মাটির উপর খাড়াভাবে দাঁড় করাইয়া রাখা যে কতটা অচিন্তিত নৈপুণ্যের পরিচায়ক ও প্রতি-মুহূর্তে তাহার পতনের সম্ভাবনাকে অক্লেশে এড়াইয়া চলায় গণিতের কত জটিল তর্ক যে পদেপদেই অতর্কিতে মীমাংসিত হইয়া যায়, তাহার বিস্তৃত হিসাব লইতে গেলে এ ব্যাপারের গুরুত্ববোধে হয়তো আমাদের চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিত।

তেমনি, কতকগুলি কৃত্রিম অযৌক্তিক ধ্বনির সংযোগে কেমন করিয়া যে আমার মনের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত দশজনের কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহার সূত্রান্বেষণ করিতে গেলে মনে হইতে পারে যে এতবড় আজগুবি কাণ্ড বুঝি আর কিছু নাই। 'গাধা' শব্দটা উচ্চারণ করিবামাত্র দশজন লোকে কোনো চতুষ্পদবিশিষ্ট সহিষ্ণুজীবের কথা ভাবিতে লাগিল। নিমন্ত্রিতের পেটে যে ক্ষুধানল জ্বলিতেছে তাহা কেহ দেখে নাই; কিন্তু সে 'লুচি' 'লুচি' বলিয়া বাতাসে একটা তরঙ্গ তুলিবামাত্র চক্রাকার ঘৃতপক্ব দ্রব্য বিশেষ দেখিতে-দেখিতে তাহার পাতে হাজির! অথচ এ সকলের কোনো ন্যায়সঙ্গত সাক্ষাৎ কারণ দেখা যায় না; কারণ নামের সঙ্গে নামীর সাদৃশ্য বা সম্পর্ক যে কোথায়, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ভাষা জিনিসটা গোড়া হইতেই একটা কৃত্রিমতার কারবার। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষার ব্যবহারে কেবা নিরস্ত থাকে!

সুবিধার খোঁজ করিতে গেলেই তাহার আনুষঙ্গিক দু-চারটা অসুবিধা স্বীকার করিতেই হয়। সুবিধার খাতিরে আজ একটা জিনিসকে স্বীকার করিয়া লইলে দুদিন বাদে সে কিছু না কিছু অন্যায় দাবি করিবেই। কার্যের সুব্যবস্থার জন্যই লোকে নানারূপ কার্যপ্রণালী ও নানারূপ নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কার্যত অনেক সময়ে তাহার ফল দাঁড়ায় ঠিক উল্টা। যেটা উপলক্ষ্য থাকা দরকার সেইটাই একটা প্রধান লক্ষ্য হইয়া

নূতন কতগুলি অসুবিধার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের এক-একটা বিধিব্যবস্থা মূলত সুযুক্তি-প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কালক্রমে অন্যায় রকম ব্যাপকতা ও ঔদ্ধত্য লাভ করিয়া তাহারা কিরূপে পুরুষপরম্পরায় মানুষের সহজবুদ্ধির ঘাড়ে চাপিয়া বসে, আমাদের দেশে তাহার ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্তের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। যে কারণে মানুষ শাস্ত্রব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া তাহার অনুশাসন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, ঠিক সেই কারণেই মানুষের চিন্তা আপনার উদ্দিষ্ট সার্থকতাকে ছাড়িয়া কতগুলি বাক্যের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। এ অবস্থায় বাক্য যে মাথায় চড়িয়া বসিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

সব জিনিসেরই একটা সোজা পথ বা শর্টকাট খুঁজিবার চেষ্টা মানুষের একটা অস্থিমজ্জাগত দুর্বলতা। কোনো একটা চিন্তাধারার আদ্যোপান্ত অনুসরণরূপ দুরূহ কার্যকে সংক্ষেপে সারিবার জন্য আমরা মোটামুটি কতগুলি শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের আশ্রয় লইয়া মনে করি ঐসকল তত্ত্বের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। ডারউইনের ইভোলিউশন থিওরি বা অভিব্যক্তিবাদ জিনিসটা যে কি, সেটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করি না। কিন্তু ইভোলিউশন বা অভিব্যক্তি কথাটাকে আমরা খুব বিজ্ঞের মত গ্রহণ করিয়া বসি, এবং আবশ্যক হইলে ও-বিষয়ে সাবধানে দু-চারটা মতামত যে ব্যক্ত করিতে না পারি এমন নয়।

কথায় বলে, "ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়।" ভাষারূপ বাহনটার খাতিরে চিন্তা যে কেমন করিয়া পঙ্গুত্বলাভ করে তাহার দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি চারিদিকেই। যে-কোনো জটিল জিনিসকে কতগুলি পরিচিত নামের কোঠায় ফেলিয়া লোকে মনে করে বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি করা গেল। ইংরিজি গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া একজন ইংরেজ আকাশ-পাতাল ভাবিয়া অস্থির যে এই লেখাগুলিকে তিনি কোন পর্যায়ভুক্ত করিয়া কি ভাবে দেখিবেন! পরে যখন তাঁহার খেয়াল হইল যে এগুলিকে মিস্টিক্ আইডিয়ালিজম্ বা ঐরূপ একটা কিছু বলা যাইতে পারে তখন তাঁহার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর হইল এবং তিনি এমন একটা নিশ্চিন্ততার ভাব প্রকাশ করিলেন যেন তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকি নাই।

এক-একটা কথা আসে অতি নিরীহভাবে চিন্তার বাহনরূপে। কিন্তু চিন্তার আদর তো চিরকাল সমান থাকে না; সুতরাং তাহার আসনচ্যুতি ঘটিতে কতক্ষণ? বাহনটা কিন্তু অত সহজে হটিবার নয়; সে তখন একাই

চিন্তার ক্ষেত্রে দাপাদাপি করিয়া আসন জমাইয়া রাখে। ইহাকেই বলি ভাষার অত্যাচার। ভাষা ভাববাহন কার্যেই নিযুক্ত থাকুক; সে আবার চিন্তার আসরে নামিয়া আপনার জের টানিতে থাকিবে কেন? শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বে 'মায়া' শব্দটার অর্থ কি, আমরা হয়তো কোনকালে ভুলিয়া বসিয়াছি, কিন্তু ঐ 'মায়া' শব্দটা আমাদের ছাড়ে নাই। সংসারকে এইভাবে 'কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় বাস্তবিক কি ভাবে কি করিতে বলা হইয়াছে সেকথা ভাবিবার অবসর হয় না। কতগুলি শব্দ শুনি যাহার অর্থ বা ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের চিন্তার যোগ অতি সামান্য অথচ আমাদের ধারণা এই যে কথাগুলির মধ্যে খুব এক-একটা গভীর চিন্তা নিহিত আছে। তাহার উপর এক-একটি শব্দ আবহমানকাল হইতে নিরঙ্কুশভাবে চলিত থাকিলে কালক্রমে তাহার মধ্যে স্বভাবতই এমন একটা চূড়ান্ত মীমাংসার ভড়ং প্রকাশ পায় যে শব্দের মোহে পড়িয়া আমরা কথাগুলিকেই নাড়াচাড়া করি আর মনে করি খুব একটা উচ্চচিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। একটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক কৃষ্ণলীলার সমর্থনের উদ্দেশ্যে তর্ক করিতে-ছিলেন। তাঁহার যুক্তি প্রণালীটা এইরূপ :—সত্ত্ব রজ তম এই তিন-গুণাশ্রিত পুরুষ তিন রকম ভাবাপন্ন সুতরাং তিনের সাধনমার্গ ও অধিকারভেদ তিনপ্রকার। সুতরাং নিম্নস্তরের অবিদ্যাশ্রিত আদর্শের দ্বারা সাত্ত্বিকী-প্রকৃতির আশ্রয়ীভূত নিত্যমুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিচার করিলে চলিবে কেন?—ইত্যাদি। প্রতিপক্ষ বেচারা বাক্যজালে আবদ্ধ ও প্রত্যুত্তর দানে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। সগুণ-নির্গুণ পুরুষপ্রকৃতি প্রাণ কারণ শব্দব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি শব্দঘটার সাহায্যে নিজ-নিজ বক্তব্যের মধ্যে গাম্ভীর্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে ভাবটুকু ছিল, সে কোনকালে খোলস ছাড়িয়া পলাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে? ঐ এক-একটা কথায় আমরা যে পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহাকে যতবার এবং যত সহজে মুখস্থ বুলির মতো আওড়াইতে থাকি, চিন্তাও ততই প্রমাদ গণিয়া একপা-দুইপা করিয়া হাঁটিতে থাকে। কে অত পরিশ্রম করিয়া লুপ্তচিন্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। শব্দের গায়ে চিন্তার ছাঁটছুট যাহা লাগিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট, বাকিটুকু তোমার রুচি ও কল্পনা অনুসারে পুরাইয়া লও। ছাতার নিচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা

দেখি ভাষার ছাতা আর চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না।

এক-একটা কথার ধুয়া আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়। মানুষের যে কোনো আচার-অনুষ্ঠান চালচলন বা চিন্তা-ভঙ্গীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি সনাতন ধর্মবিধিকে উড়াইয়া দিতে চাও?" এবং সনাতন ধর্মের নজীরকে অর্থাৎ ঐ "সনাতন" শব্দটার নজীরকে এমন অকাট্যভাবে মনের সম্মুখে দাঁড় করায়, যেন ইহার উপর আর কথা বলা চলে না। তখন যাহা কিছু যথেষ্ট জীর্ণ ও পুরাতন তাহাই আমাদের কাছে সনাতনত্বের দাবী করে এবং আমাদের কল্পনায় সনাতনধর্ম জিনিসটা যেকোনো বিধি নিয়ম আচার অনুষ্ঠানাদির সমারোহ সজারুবৎ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া ওঠে। কারণ, এই সকল শোনা কথায় আমরা এতই অভ্যস্ত যে ইহাদের এক-একটা মনগড়া অর্থ আমাদের কাছে আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সেটাকে আবার ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক বোধ করি না। শাস্ত্রে 'ত্যাগ' বলিতে কি-কি ছাড়িতে উপদেশ দেয় তাহা বুঝি আর নাই বুঝি আমরা ঐ ত্যাগ শব্দটার সঙ্গে ছাড়ার সংস্কারটুকুকে ধরিয়া রাখি। অমুক সংসার ছাড়িয়া পলাইয়াছেন, তিনি ত্যাগী; অমুক এত টাকা দান করিয়াছেন, তিনিও ত্যাগী। কর্মফলাসক্তি কিছুমাত্র কমিল না, দেহাত্মবুদ্ধির জড় সংস্কার ঘুচিল না, প্রভুত্বের অভিমান ও অহঙ্কার গেল না; অথচ শাস্ত্রবাক্যেরই দোহাই দিয়া 'ত্যাগের মাহাত্ম্য' প্রমাণিত হইল। এইজন্য এক-একটা কথা-সংশ্লিষ্ট চিন্তাকে মাঝে-মাঝে আঘাত দিয়া জাগাইয়া দিতে হয়। কারণ, চিন্তা সে নিজগুণে যতই বড় হউক না কেন, আর দশজনের মনে নিত্য নূতন খোরাক না পাইলে তাহার ক্ষয় অনিবার্য। 'জাতীয়ভাব' 'ভারতীয় বিশেষত্ব' 'হিন্দুত্বের ছাঁচ' প্রভৃতি নাম দিয়া আজকাল যে জিনিসটাকে আমরা শিল্পে সাহিত্যে অশনে বসনে প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, তাহার স্বরূপলক্ষণাদির বিষয়ে আমাদের ধারণা যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, তাহাতে ঐ-ঐ শব্দনির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি আমাদের আস্থা ও সম্ভ্রমের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। সেটা হয়তো ভালোই, কিন্তু দশদিক হইতে যথেষ্ট মাত্রায়, অথবা যথার্থভাবে আঘাত না খাওয়ায় জিনিসটা যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে বোধহয় যে ঐ শব্দগুলিকে একবার বিশেষ রকমে ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক।

আমার চিন্তাকে কতগুলি শব্দের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলাম বলিয়াই

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। সে চিন্তাতরঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহাতেই আমার অজ্ঞাতসারে কতগুলি শব্দের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে। শব্দের অর্থ তো চিরকাল একভাবে থাকে না, পরে একসময়ে হয়তো এক-একটা শব্দের অর্থ লইয়াই মারামারি বাধিয়া যাইবে, আমার চিন্তার সদ্গতি হওয়া তো দূরের কথা। ঋগ্‌বেদের একটি ঋকের অর্থ রমেশবাবু প্রভৃতি এইরূপ করেন—

"বৃষ্টিজল শব্দ করিয়া পড়িল এবং (মেঘ বায়ু ও কিরণ) এই তিনের যোগে গাভীরূপী পৃথিবী বিশ্বরূপী (অর্থাৎ শস্যাচ্ছাদিত) হইল"—ইত্যাদি। পন্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের মতে ইহারই অর্থ—

"পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্যশক্তি এই ঘূরানকার্যে নিযুক্ত আছেন। এই শক্তিসকলের মধ্যস্থলে গর্ভদেবতা অটলভাবে স্থির রহিয়াছেন"—ইত্যাদি।

এখানে এক-একটি শব্দের অর্থবাহুল্যই এরূপ ব্যাখ্যা বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। আবার, পুরাণাদি বর্ণিত রূপগুলিকে নিংড়াইয়া বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব নিষ্কাশনের চেষ্টায় যে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অর্থবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন। একই কথার অর্থ তোমার-আমার কাছে একরকম আর অন্য দশজনের কাছে অন্যরকম, এরূপ ঘটিলে ভাষার উদ্দেশ্যই পন্ড হইয়া যায়। তত্ত্ব জিনিসটা যখন কবিত্বের খাতিরে রূপকের মধ্যে একেবারে হাত পা গুটাইয়া বসে, অথবা সে যখন 'হিং টিং ছটের' আকার ধারণ করে, তখন ভবিষ্যদ্‌বংশের কল্পনায় সে অতি সহজেই কাব্য বা ইতিহাস বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যাহা-ইচ্ছা-তাহাই হইয়া দাঁড়ায়।

একে তো ভাষার অর্থভেদ সর্বদাই ঘটিতেছে, তাহার উপর নিজের পছন্দমতো অর্থ বাহির করিবার দিকে মানুষের স্বভাবতই একটু আধটু নজর থাকে। ইহার মধ্যে আবার যদি ইচ্ছাপূর্বক বা স্পষ্টই খানিকটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষের বুদ্ধি এ অনর্থ ঘটাইবার সুযোগ ছাড়িবে কেন? সেকালে রোমীয় ধর্মশাসনের বিধি-অনুসারে অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহীর জন্য এই মর্মে একটা ব্যবস্থা দেওয়া হইত, "ইহাকে আঘাত করিও না, কিন্তু বিনা রক্তপাতে ইহার দুর্মতির প্রতিবিধান কর।" এইরূপে অশ্বত্থামার নিধনসংবাদে 'ইতিগজ' সংযোগের ন্যায়, ব্যক্তভাষার পশ্চাতে অব্যক্ত অভিপ্রায়ের স্বগত উক্তিটা ভাষার অর্থকে যে কখন কোনমুখে ফিরাইয়া দেয় তাহা অনেক সময়ে নির্ণয় করা কঠিন।

ভাষা যে কেবল চিন্তাকে বিপথে ঘোরাইয়া বা তাহার আসন দখল করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে; সে এক-এক সময়ে উদ্যোগী হইয়া আমাদের অজ্ঞতার উপর পাণ্ডিত্যের রঙ ফলাইতে থাকে। নিতান্ত সামান্য বিষয়েরও প্রকাণ্ড সংজ্ঞানির্দেশ করিয়া, অথবা যাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিনা তাহারও একটা নামকরণ করিয়া, আমাদের বিজ্ঞতার ঠাট-বজায় রাখে এবং আমাদের পাণ্ডিত্যের অভিমানকে নানারূপ ছেলেভুলানো কথার সাহায্যে আশ্চর্য রকমে জাগাইয়া রাখে। একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো একটা জিনিস হয়তো আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষীগোপালের কাজ করে মাত্র, অথচ তাহার উপস্থিতিটা কেন যে সেই ক্রিয়া নিষ্পত্তির সহায়তা করে, বৈজ্ঞানিক তাহার কারণ খুঁজিয়া পান না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছাত্র যখন এই ব্যাপারটাকে 'ক্যাটালিটিক একশন্' নাম দিয়া ব্যাখ্যা করে তখন সে হয়তো মনেই করে না যে এখানে ঐ শব্দটার আড়ালেই একটা প্রকাণ্ড অজ্ঞতার ফাঁক রহিয়াছে। আফিং খাইলে ঘুম আসে কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক সময়ে সোমনিফেরাস্ প্রিন্সিপলস্ বা নিদ্রোৎপাদিকা শক্তির কল্পনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। কিন্তু নিদ্রোৎপাদিকা শক্তির গুণে নিদ্রা আসে এ ব্যাখ্যা আর এখনকার যুগে ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না; কারণ কেবল ভাষার উলট-পালটে যে যুক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না, এ তত্ত্বটা এ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু সৃষ্টিরহস্যের মূলে 'মায়া' বা 'অবিদ্যার' কল্পনা ঠিক এই শ্রেণীভুক্ত না হইলেও উহা যে আদৌ একটা ব্যাখ্যা বা মীমাংসা নয়, মূল প্রশ্নেরই স্পষ্টতর পুনরুক্তি মাত্র এবং এই নামকরণে যে কেবল আমাদের চিন্তার পরাজয়কেই স্বীকার করা হয়, একথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। বিজ্ঞানের এক-একটি সিদ্ধান্ত বা 'ল' আওড়াইয়া আমরা মনে করি খুব একটা কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। অমুক কাজটা অমুক 'ল' অনুসারে সম্পন্ন হইল; 'এ্যাকর্ডিং টু নিউটন'স্ থার্ড ল অফ মোশন,' নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান হইল। বলা বাহুল্য আইনটার খাতিরে কাজটা নিষ্পন্ন হয় না। কার্যতঃ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার তুল্যতা দেখা যায় বা এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। 'অমুক সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়' বলায় নূতন কিছুই বলা হইল না, কেবল সিদ্ধান্তকে তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গেল। তেমনি, আলোকতত্ত্বের বর্ণনায় 'ট্রান্সভার্স্ ভাইব্রেসনস্ অফ দি লিউমিনিফেরাস্ ইথার' বলায় চিত্তের চমক লাগিতে পারে; কিন্তু

তাহাতে যে আমার আলোকচৈতন্যের কোনোরূপ মীমাংসা হয় না, এ কথাটা শিক্ষিত লোকেও অনেক সময়ে ভুলিয়া যায়।

ভাষার একটা বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা এই যে, চিন্তার আদ্যোপান্ত ইতিহাস বহন করিতে সে বাধ্য নয়। বড়-বড় তত্ত্বগুলিকে সে এক-একটা সংক্ষিপ্ত নাম বা সূত্রের আকারে ধরিয়া রাখিতে পারে। জ্যামিতিতে বিন্দু কল্পনার আবশ্যক হইলে, প্রত্যেকবার বলিতে হয় না যে—"এমন একটি অতিক্ষুদ্র দেশাংশ গ্রহণ কর যাহার আয়তন-কল্পনা সম্ভব নয় কিন্তু অবস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে।" বিন্দু শব্দটার উল্লেখ করিলেই এই সকল চিন্তার ছায়া মনের মধ্যে আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। সেইরূপ অনেক জটিল তত্ত্ব আছে যাহাকে গোটাতত্ত্বের আকারে প্রত্যেকবার আওড়ানো চলে না। অথচ তাহাকে সংক্ষেপে দু-চারিটা কথায় সারিতে গেলেও বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, আত্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এক-একটা কথার সঙ্গে মানুষের সঙ্গত অসঙ্গত নানাপ্রকার সংস্কার এমনভাবে জড়িত থাকে যে এক-একটা শব্দ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের অলক্ষিতে এক-একটা ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্ম বলিতে, আত্মা বলিতে, হাজার লোকে হাজার রকম অর্থ করে, অথচ এই কথাগুলি লইয়া লোকে এমনভাবে মারামারি করে যেন অর্থ সম্বন্ধে আর কোনো মতান্তর নাই।

এক ইংরেজ ভদ্রলোক বাইবেলের একটু উক্তি তুলিয়া বলিতেছিলেন, "তোমরা তো বিশ্বাস কর যে এই সংসারটা কেবল 'ফ্লেস' নয়, জড়ের ব্যাপার নয়, ইহার মধ্যে স্পিরিট আছেন।" আমি অতর্কিতে কথাটাকে স্বীকার করায় তিনি ভারি খুশি হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরা ওরিয়েণ্টাল (প্রাচ্য) লোক কিনা, তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে। তোমাদের পক্ষে প্রেত-তত্ত্বে বিশ্বাস করা খুব স্বাভাবিক।" তখন বুঝিলাম তিনি স্পিরিট বলিতে ভূতপ্রেত ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না।

জগতের কাছে দাঁড়াইতে গেলে চিন্তামাত্রকেই কতগুলি শব্দকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে হয়। কোনো-কোনো স্থলে এই যোগটা এত ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায় যে শব্দটাকে বাদ দিয়া চিন্তাটাকে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই লীলা রস ভক্তি ভক্ত ভগবান প্রভৃতি কতগুলি শব্দকে একেবারেই বাদ দেওয়া চলে না। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই হেরিডিটি,

ভেরিয়েশন, স্ট্রাগ্‌ল্ ফর এক্সিস্‌টেন্‌স্, ন্যাচারল সিলেকশন্ (উত্তরাধিকার, পরিবর্ত, জীবন-সংগ্রাম, যৌননির্বাচন) প্রভৃতি কথাগুলি অপরিহার্যরূপে আসিয়া পড়ে। কথাগুলিকে না বুঝিয়া গ্রহণ করায় তো বিপদ আছেই, বুঝিয়া গ্রহণ করিলেই যে বিপদ একেবারে কাটিয়া যায় তাহাও নহে। মনের এক-একটি চিন্তাকে কতগুলি শব্দের আটঘাটের মধ্যে বাঁধিয়া দিলে সে চিন্তার পথ ভবিষ্যৎ যাত্রীর পক্ষে অনেকটা সুগম হইতে পারে; কিন্তু চিন্তাটাও ক্রমে প্রণালীবন্ধ হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে দেখা যায় যে পরবর্তী যুগে যাঁহারা সেইসকল তত্ত্বের পুর্ণমীমাংসা করিতে আসেন, তাঁহারা গোড়াতেই দু-একটা কথার বাঁধ ভাঙিয়া লইতে বাধ্য হন। যে বিষয়কে বা মতকে সাধারণ কথায় তত্ত্বের মতো করিয়া বুঝাইতে গেলে মনে তেমন কোনো সম্ভ্রমের উদয় হয় না, সে-ই যখন দু-একটা বহুজনস্বীকৃত শব্দের ধ্বজা উড়াইয়া আসে তখন তাহার মর্যাদা ও গুরুত্ব যেন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। শব্দের আধিপত্য তখন আমাদের কাছে নানারূপ অসংগত দাবী করিতে থাকে। ক্রমে হয়তো সেই ব্যাপারটাই যদি কেহ অন্যরূপ ভাষায় বা অন্য কোনো দিক হইতে ব্যক্ত করিতে আসে, সেই পরিচিত শব্দগুলির অভাবে তাহা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া ওঠে। অথবা কাহারও চিন্তা ঠিক সেই-সেই শব্দ-নির্দিষ্ট পথে না চলিলেই মনে হয় যেন তাহা না জানি কোন অদ্ভুত পথে চলিয়াছে। হয়তো আর দশজন লোকের চিন্তার মধ্যে সেই পরিচিত প্রচলিত শব্দগুলির ঠিক যথাযথ স্থান নির্ণয় করাটা তখন ভারি একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মনের এইপ্রকার সংস্কারই মানুষের কাছে সর্বদা 'হাঁ-কি-না' 'এটা-না-ওটা' 'মানো-কি-মানো না' গোছের একটা প্রশ্ন দাঁড় করায়। নিরীহ ধর্মার্থীর কাছে সে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী?" অথচ সে বেচারা হয়তো কোনো একটা বিশেষ বাদের পক্ষ হইয়া লড়াই করিবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করে না, হয়তো তাহার মনের কথাটাকে ঐরূপ একটা তত্ত্বের মারামারির আকারে প্রকাশ করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক মত নির্ণয়ের জন্য এক সময় জিজ্ঞাসা করা হইত, "তুমি মডারেট না একস্‌ট্রিমিস্‌ট্" এই প্রশ্নই যেন রাজনীতির প্রকাণ্ডতম সমস্যা আর ইহার মধ্যেই যেন রাজনৈতিক শ্রেণী-বিভাগের নিগূঢ়তম সংকেত নিহিত রহিয়াছে। মডারেট একস্‌ট্রিমিস্‌ট্ (মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী) লিবারেল কন্‌সারভেটিভ (উদারনৈতিক

ও রক্ষণশীল) ক্যাথলিক প্রোটেস্টানট্ (প্রাচীনপন্থী ও প্রতিবাদপন্থী) প্রভৃতি কথার দ্বন্দ্ব একেবারে নিরর্থক না হইলেও, ইহার ফলে কতগুলি সাময়িক মত-বৈষম্য অযৌক্তিক দ্বৈততত্ত্বের আকার ধারণ করিয়া এক-একটি বিরোধকে চিরস্থায়ী করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। আপাত-বিরুদ্ধ কথার মূলে যে সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত থাকে ভাষার বিরুদ্ধতা সে তত্ত্বটাকে গোপন করিয়া রাখে। এদেশে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ, কর্ম ও বৈরাগ্যের বিরোধ, প্রেম ও অনাসক্তির বিরোধ, কতক-পরিমাণে শব্দবৈষম্য-মূলক কৃত্রিম দ্বন্দ্বেরই পরিচায়ক। যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে এইসকল কথার ঘোর-ফেরের মধ্যে আটকাইয়া যান তাঁহাদের ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, একটা না-হয় অপরটার পর্যায়ে পড়িতেই হয়।

মানুষে প্রশ্ন করে, "তুমি জাতীয়তা জিনিসটা বিশ্বাস কর কিনা" "তুমি হিন্দুত্বকে মানো কিনা" আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁ-না গোছের জবাব প্রত্যাশা করে। বাস্তবিক কিন্তু অনেক স্থলেই পাল্টা প্রশ্ন ছাড়া আর কোনো জবাব সম্ভব হয় না, নতুবা কোন-কোন অর্থে কি-কি কথা কতদূর স্বীকার করি বা না করি তাহার একটা বিস্তৃত ফর্দ দিতে হয়। আগে শুনি তুমি যাহাকে জাতীয়তা বল সেটার লক্ষণ কি? হিন্দু বা হিন্দুত্ব বলিতে তুমি কি-কি জিনিস বুঝিয়া থাক? তবে তো বলিতে পারি তোমার জাতীয়তাকে, তোমার হিন্দুত্বকে আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত কিনা। আমি অমুক জিনিসটাকে মানি আর অমুকটাকে মানি না, এক নিশ্বাসে একথা বলিয়া ফেলা কার্যত যেমন সহজ তেমনি মারাত্মক। জগতের অর্ধেক মারামারি কেবল কথারই মারামারি। আমার অমুক ধর্ম বাস্তবিক কি বলেন তাহাও আমি জানি না, আর তোমার যথার্থ বক্তব্য ও আদর্শ কি তাহারও ধার ধারি না, অথচ তোমার কাছে উত্তর দাবী করি তুমি অমুক ধর্মটা মানো কিনা অর্থাৎ ঐ শব্দসংসৃষ্ট আমার সংস্কার-গুলিকে মানো কিনা! পুরাণে লেখে গন্ধর্বেরা বাক্যভোজী, তাহারা নাকি শব্দ আহার করিয়া থাকে। এক হিসাবে, গন্ধর্বশ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যে বড় কম নয়। কিন্তু অর্থই যে বাক্যের সার এবং অর্থটাকে সম্যকরূপে পরিপাক না করিলে শব্দটা যে মনের পুষ্টি-সাধনের অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে এই সহজ কথাটা আমাদের মনে থাকে না বলিয়াই চিন্তার কুপুষ্টিজনিত নানারকম রোগের সৃষ্টি হয়। বিচারবুদ্ধির পাদুকাস্পর্শে বাক্যমাত্রসার প্লীহাজীর্ণ সংস্কারগুলির অপঘাত-মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া

আমরা এক-একটা শিখানো বুলিকে অতিরিক্ত যত্নের সঙ্গে যুক্তিতর্ক সন্দেহের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখি। "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর" বলিয়া প্রাণপণে তর্ক করি এবং বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করি যে 'বস্তু'কে পাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

ভাষা যে নিজের অর্থ গৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেইজন্যই এক-একটা সত্যকে পঞ্চাশবার পঞ্চাশরকম ভাষায় পঞ্চাশদিক হইতে দেখা আবশ্যক হয়। কিন্তু তবু দেখা যায় যে সত্যের মূলে প্রবেশ করিতে হইলে আর ভাষা পাওয়া যায় না, অথবা এমন ভাষা পাওয়া যায় না যাহা সত্যানভিজ্ঞের কাছে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে পারে। অদ্বৈততত্ত্বের কথা নির্বিকল্প সমাধির কথা বলিয়াও এবং "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপং বিহায়" ইত্যাদি রূপকের ব্যবহার করিয়াও ঋষিরা বলিতেছেন, "এ সকল তত্ত্বকে প্রকাশ করা যায় না, ইহা ভাষায় জানাজানি হইবার বিষয়ই নহে।" বুদ্ধদেব নির্বাণ তত্ত্বের কথা আজীবন বলিয়া গেলেন কিন্তু "নির্বাণ কি" এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো উত্তরই দিলেন না। আমরা কিন্তু এ-সকল কথাকে ভাষার মজলিশে টানিয়া অহরহই মারামারি করিয়া থাকি।

ভাষার আশ্রয় লইয়া যেকোনো অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাকেই যদি ভাষার অত্যাচার বলা যায়, তবে ভাষা-ঘটিত আরো অনেকপ্রকার অত্যাচারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার কার্যটা তোমার মনঃপূত না হইলে তুমি যে সকল বাক্য ব্যবহার কর, সেও এক হিসাবে ভাষার অত্যাচার। অনিচ্ছুক ছাত্রকে পণ্ডিতমহাশয় যখন শাসন অনুশাসনের দ্বারা সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য করেন ছাত্র নিশ্চয়ই তাহাকে ভাষার অত্যাচার বলিবে। তোমার ক্ষুধার সময়ে বা ব্যস্ততার মুহূর্তে তোমার কাছে দর্শনের তত্ত্ব বা কবিত্বের কথা আওড়াইতে গেলে তুমিও বলিবে—ভাষার অত্যাচার। ভাষা যখন বন্ধন ছিঁড়িয়া বি-ইউ-টি বাট পি-ইউ-টি পুট ইত্যাদিবৎ বৈষম্যের সৃষ্টি করে অথবা সে যখন রুশিয়ার মানচিত্রে বসিয়া তোমার উচ্চারণ শক্তির পরীক্ষা করিতে থাকে, সেও একরূপ ভাষার অত্যাচার বৈ কি! আর সর্বশেষে, এই প্রবন্ধটিকে আরো বিস্তৃত করিয়া ফেনাইতে গেলে তাহাও অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ক্যাবলের পত্র

....

শ্রীমান বাঞ্ছারাম উন্নতিশীলেষু,—

তুমি যে আমার কোনো চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না লেখাটাকে কার্য বলে ধরা যায় কিনা, সেটা একটু ভাবা দরকার। কিছু না করাটাও যদি একটা কাজ হয়, তবে তোমরা পৃথিবীতে কেজো মানুষ আর অকেজো মানুষ বলে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তোমরা করেছ বলছি এইজন্যে যে ও দ্বন্দ্বটিকে আমি বরাবরই অস্বীকার করে এসেছি। আমার ধারণা এই যে, আমসত্ত্ব হলেই যেমন আমের আমসত্ত্ব, তেমনি মানুষ মানেই কাজের লোক। ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ দুটোর মধ্যে তফাতটা কেবল কৃ-ধাতু আর অস্ ধাতুর তফাত, আর ব্যাকরণ মতে সব ধাতুই ক্রিয়াবাচক। "আমি আছি" এই তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য এবং প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে সে আপনাকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হলে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম করতে হয় কিন্তু তাই বলে ফুলকে ফোটাবার পক্ষে ও উপায়টি খুব প্রশস্ত নাও হতে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে নিয়ে যাঁরা চব্বিশঘণ্টা টানাটানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বোঝেন না যে, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না, কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

উপনিষদ বলেছেন আত্মা অব্যয়, আর ব্যাকরণেও দেখতে পাই যে অব্যয়ের রূপ নেই। কিন্তু জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেন না, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেটা জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়াপদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটিই হচ্ছে আর্ট। রোসো, আগেই তর্ক কর না। আর্ট কাকে বলছি সেইটে আগে বুঝবার চেষ্টা কর। তুমি বলতে চাচ্ছ যে বিজ্ঞান পলিটিক্স্ বা

ফিলসফি প্রভৃতি ভারি-ভারি কর্মগুলো কি কর্ম নয়? আমার মতে ওগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার উপসর্গ মাত্র। "উপসর্গস্য যোগেন" ক্রিয়ার অর্থ যে ওলট-পালট হয়ে যায়, এটা ব্যাকরণের বিজ্ঞতা এবং সংসারের অভিজ্ঞতা এই দুই তরফেরই সাক্ষী। জীবনের ক্রিয়ার উপর ওরা মোচড় দেয়, কিন্তু কোথাও আঁচড় দিতে পারে না। জীবনের উপর আঁচড় দেওয়া অর্থাৎ আপনার ছাপ এঁকে দেওয়া, অর্থাৎ এককথায় নতুন করে রূপ সৃষ্টি করা, এই জিনিসটাই হচ্ছে আর্ট অর্থাৎ ব্যর্গ্‌স' যাকে বলেছেন ক্রিয়েটিভ ইভোলিউশন।

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে বাঙলা দেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে, সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। তার কারণ, আমাদের দেশে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, মাল এবং মশলার পার্থক্য তাঁরা বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখতে পান না। অথচ এটা অস্বীকার করবার জো নেই যে ও বস্তুটি হচ্ছে জাতীয় খোশখেয়ালের আস্ত একটি তোষাখানা। সকলেই জানি, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সব চাইতে বড় তফাত হচ্ছে আকারের তফাত। অর্থাৎ তারা আত্মসর্বস্ব আর আমরা আত্মাসর্বস্ব; ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাকা মাত্র ফরসা। ইংরেজের ব্যাকরণে ও আচরণে ফার্স্ট পারসন্‌ হচ্ছেন আমি এবং আমরা। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাকরণটাও বেদাঙ্গ, সুতরাং তাতে পরমার্থ না থাকুক পরমার্থতত্ত্বের কোনো অভাব নেই। তাই আমাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ইনি এঁরা তাঁরা। এর মধ্যে দীনতা থাকলেও কোনো রকম হীনতা নেই, কারণ আমি ব্যক্তিটিকে আমরা বরাবর উত্তম-পুরুষ বলেই প্রচার করে আসছি। এইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের আসল তফাত। ওরা অহঙ্কারী বলেই স্বার্থপর হয়ে থাকে, আর আমরা পরার্থপর বলেই অহঙ্কার করতে পারি।

অধ্যাপক কিউম্‌রে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, মিথ্যেটাই হল সাহিত্যের আসল সৃষ্টি—কেন না, সত্যকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল এইটুকু না বলে তিনি আরো বলতে পারতেন যে, আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেটা সৃষ্টিছাড়া সেইটেকে সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানের সব সত্যিই যে সত্যি এইটে দেখানোই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবসা। সত্যিটার যে কোনো সত্তা

নেই আর মিথ্যেটা যে মিথ্যে নয়, এইটেই হচ্ছে দর্শনের সাক্ষী। কেবল আর্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সত্য-মিথ্যার স্বত্বসাব্যস্তের কোনো বালাই নেই, কেন না সাহিত্য হচ্ছে সত্য-মিথ্যার সব্যসাচী। অর্থাৎ এক কথায় বিজ্ঞান না পড়েই বোঝা যায়, দর্শন পড়লেও বোঝা যায় না, আর সাহিত্যের বেলা বোঝাপড়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না। একেই আমি বলেছিলুম, "সাহিত্যের অনাসক্তি।" দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা কারও প্রাণে লাগেনি অর্থাৎ কানে লাগেনি। কেন না, আমাদের দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও পড়া-শোনা করেন না, তাঁরা কেবল লেখাপড়াই করে থাকেন। আর তাতে করে যে জিনিসটা গজায় সেটা আক্কেল নয়, সেটা হয় টাক নয় টিকি, অর্থাৎ হয় নাস্তিকতা নয় অদ্বৈতবাদ।

দেখ কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে পড়ল। কথা বলবার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে বেশি কথা বললে কেউ শুনতে চায় না, আবার অল্পের মধ্যে সংকীর্ণ করে বললেও কেউ বুঝতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, অল্প কথার মধ্যে যতটা বাহুল্য থাকে, বেশি কথায় ততটা থাকে না। তাই সাহিত্যের একটা বড় কাজ হচ্ছে সামান্য কথাকে চালিয়ে-চালিয়ে অর্থাৎ এক্‌সারসাইজ করিয়ে, তার বাহুল্য নষ্ট করা। এক্ষেত্রে যাঁরা সংযমের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁদের এই সহজ তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব যে সাহিত্যের শব্দকে মেরে ভাষাকে জব্দ করা যায়, কিন্তু এ কাজটি সম্যকরূপে যমের উপযুক্ত হলেও তাকে সংযম বলা চলে না।

আমাদের গুরুমশাইরা বলেন যে ভাষাটার বাড়াবাড়ি হলে তার গুরুত্ব থাকে না, কেন না তাতে করে ভাষাটা হয় ভাসা-ভাসা, অর্থাৎ হাল্কা। ও সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে যে জিনিসটা যথার্থই ভাসে, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে, তাকে ডুবিয়ে দিলে যে ডোবা সাহিত্যের, অর্থাৎ বোবা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাকে শোভন বলা আর মূর্খ বলা একই কথা, কেন না সে "কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। ওর মধ্যে আরেকটু কথা আছে, সেটা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনলুম না। সে কথাটা এই যে, যে-টাকা বাজে সেই টাকাই চলে, যেটা বাজে না সেটা অচল; সুতরাং সাহিত্যের বাজারে বাজে কথাই চলে ভালো অর্থাৎ সেই কথাটাই চলে যার শব্দের জোর আছে। তুমি ভাবছ এটা নেহাত বাজে কথা। তা হওয়া খুবই সম্ভব, কেন না কথাটা সত্যি।

আমার একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলুম যে, সাহিত্যের উক্তির মধ্যে যুক্তি থাকলেই তার মুক্তি হয় না, তাতে সাহিত্যের বিস্তার হতে পারে কিন্তু তার নিস্তার হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমি এই কথাটির একটি চমৎকার উদাহরণ আবিষ্কার করেছি। "পল্লী সাহিত্য" বলে একটা কথা আমি অনেকদিন ধরে শুনে আসছি কিন্তু ও বস্তুটা যে কি তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্যন্ত জানা ছিল না। সেইজন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লীসাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ করে অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ করে কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ওতে করে আসল যে কথাটি বলা হচ্ছে, সেটা ওর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি। বলা কথাটির অর্থই হচ্ছে কিছু কথা বলা, কিন্তু কথার উপর অসামান্য বলপ্রয়োগ করলেই যে বলা কাজটি খুব ভালো করে সম্পন্ন হয়, আমার অন্তত এরকম বিশ্বাস নেই। সাহিত্যকে তাজা করবার জন্য পণ্ডিতমশাই যে রকম তেজ প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর প্রবন্ধটিকে পল্লীসাহিত্য না বলে মল্লীসাহিত্য অর্থাৎ মেয়েলি কুস্তির সাহিত্য বলা উচিত ছিল, কেন না, ওর মধ্যে প্রতাপের চাইতে প্রলাপের মাত্রাই বেশি।

পণ্ডিতমশাই বলতে চান যে সাহিত্যটাকে শহরের বদ্ধবাতাসে আবদ্ধ না রেখে, তাকে "সহজ সুস্থ পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন" অর্থাৎ তাকে ঘন-ঘন হাওয়া খেতে পাড়াগাঁয়ে পাঠানো দরকার। পণ্ডিত-মশাই বলেন, "আমি মনে করি ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব।" প্রস্তাবের মাঝখানে "আমি মনে করি" বলে উত্তম পুরুষের অবতারণা করলেই যে প্রস্তাবটা উত্তম হয়ে পড়ে এরকম যুক্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনেক উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতমশাই ভরসা করেন যে তাঁর ব্যবস্থামতো চললে পরে সাহিত্যের ভাব এবং ভাষা হৃষ্ট এবং পুষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। শহুরে সাহিত্যকে গ্রামের হাওয়া খাইয়ে গ্রাম-ফেড করে পুষতে গেলে যে জিনিসটা পুষ্টিলাভ করে, সেটা "গ্রামার" নয়, সেটা হচ্ছে গ্রাম্যতা।

ব্যর্গ্‌সঁ বলেছেন, মানুষের হাত পা কাটলেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের উপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও বস্তুটি যদি ওখানে না থাকত তা হলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তিটা

আরো গুরুতর হত। কতগুলো ইংরিজি পড়া মাথাকে বাংলা সাহিত্যের ঘাড়ের উপর বসতে দেখে, পণ্ডিতমশাই তার মুণ্ডপাত করতে চান, কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখেননি যে তাতে করে তাঁর নিজের প্রবন্ধকেই তিনি কবন্ধ করে ফেলেছেন। যাহোক প্রবন্ধের একটা গুণ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনে, সেটা এই যে, সাহিত্য বলতে পণ্ডিতমশাই কি বোঝেন সেটা না বুঝলেও, তিনি কি না বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোনো-কোনো সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জুলে কিন্তু জল হয় না। তাই শুনলুম সেদিন একজন আক্ষেপ করে বলেছেন যে আমার কথাগুলো নাকি "সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না।" বোঝা যে যায় না এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেননা সংসারের কোনো বোঝাই আপনা থেকে যায় না, তাকে কষ্ট করে বয়ে নিতে হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কি, সেটা আমি আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ অর্থাৎ ও বস্তুটি ভগবান যাকে দেন তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এবিষয়ে যাঁদের কিছু কমতি আছে তাঁরা বোধহয় এইটে বোঝেন না যে ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।

—ক্যাবল

৩ চিরন্তন প্রশ্ন । দৈবেন দেয়ম্

চিরন্তন প্রশ্ন

....

একটা চিরন্তন প্রশ্নের বোঝা বহন করিয়া মানুষ সংসারে বিচরণ করিতেছে। প্রশ্নটা যে কি, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর বা সুযোগ অতি অল্প লোকেরই জোটে অথচ সকলেরই মনে এ সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার মনে প্রশ্নটা একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং যিনি ভরসা করিয়া তাহার একটা উত্তর দাবি করিতে পারেন জগতের চিন্তাসম্পদের হিসাবে তিনিই কৃতী লোক।

সেই একই অব্যক্ত প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও ধর্মজগতে নানা ভাবে নানা আকারে জাগিয়া উঠিতেছে। সেই একই প্রশ্নের তাড়নায় মানুষের চিন্তা বিচিত্র জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া বিচিত্র রকম উত্তরের প্রত্যাশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ যদি স্বচ্ছন্দ পশু-জীবনের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারিত তবে এ প্রশ্নের আদৌ কোনো প্রয়োজন হইত না কিন্তু সর্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, তাহার দৈনিক জীবনযাত্রার আয়োজন করিতে গিয়াও, তাহাকে পদে-পদেই তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় আহার নিদ্রা স্বাচ্ছন্দ্যের অতিরিক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। যে যেপথেই চলি না কেন, যে যতই চিন্তাহীন, সাধনবিমুখ, সংসারাসক্ত জীবন যাপন করি না কেন প্রশ্নটার হাত কেহই সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারে না। জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, জীবনের সফলতার ভিতর দিয়া, না হয় জীবনের ব্যর্থতার ভিতর দিয়া, আমাদের সকল অন্বেষণ বারবার সেই একই প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে এবং আমরা সকলেই আমাদের প্রত্যেকের সাধ্য ও অবস্থামতো চিন্তা ও আচরণের দ্বারা জগতে তাহার এক-একটা স্পষ্ট বা অস্ফুট জবাব রাখিয়া যাইতেছি।

শিল্পে ও কাব্যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান জগতে, মানুষের সকল প্রকার সাধনা-ক্ষেত্রে, আমরা দেখিতে পাই এক-একটা প্রশ্ন থাকিয়া-থাকিয়া অনিবার্য-রূপে জাগিয়া ওঠে। মানুষ তাহার প্রাত্যহিক সাধনা ও কর্তব্যানুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়াও এক-একবার অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "আমার লক্ষ্য কি?" "এ অন্বেষণের শেষ কোথায়?" শিল্পীর অন্তর্নিহিত

রসানুভূতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে শিল্পসাধনায় প্রবৃত্ত করে, জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্যই বৈজ্ঞানিক নব-নব জ্ঞানের অন্বেষণে ধাবিত হন, সংসারী মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ও সুখাসক্তির লালসায়, প্রেমের আকর্ষণে বা সমাজ সংগ্রামের পেষণে সহজেই কত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়া চালিত হয় অথচ এই সকল অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রয়াসের মূলে যে কি একটা অপূর্ব রহস্য নিহিত আছে, মানুষ কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারে না। জ্ঞান প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধানে মানুষ নিরন্তরই ছুটিতেছে অথচ সেই সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্ন করিতেছে, "কোথায় চলিয়াছি," "এ কিসের আকর্ষণ!" ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এক অজানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, কেবল এই জ্ঞানটুকু লইয়াই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারে না, "কোথায় চলিয়াছি" "কেন চলিয়াছি" এ প্রশ্নও সঙ্গে-সঙ্গেই চলিয়াছে। অনেক সময়ে আমরা মনে করি বুঝিবা আমাদের জ্ঞানগত কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই এই সকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতেছি; সেইজন্য প্রশ্নটাকে অবান্তর জ্ঞান করিয়া আমরা অনেক সময়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রশ্ন আর আমাদের ছাড়িতে চাহে না। কার্যত দেখা যায় আমাদের জীবনের সকল প্রশ্ন সকল সমস্যার মূলে এইরূপ একটা প্রশ্ন নিহিত রহিয়াছে। যখনই কোনো নৈতিক বা সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই, "কি করিব?" "কেন করিতেছি?" এই প্রশ্ন যখনই মনের মধ্যে উদিত হয়, তখনই দেখি সঙ্গে-সঙ্গেই আর একটা প্রশ্ন ছায়ার মতো ঘুরিতেছে, "আমি কে?" "এই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি?" "আমার জ্ঞান, আমার অনুভূতি, আমার ভালো-লাগা না-লাগার মধ্যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে?" হাতের কাছে এই সকল প্রশ্নের কোনো উপস্থিত মীমাংসা না পাইয়া মানুষ অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে। মানুষ মনে করে, এ আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া লাভ কি? এবং গোড়ার প্রশ্নটাকে একেবারে বাদ দিয়া একটা কোনো আপাত-যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার সঙ্গে আপস করিয়া লইতে চায়। ইহা হইতেই "জগতের কল্যাণ" "দি গ্রেটেস্ট্ গুড অফ্ দি গ্রেটেস্ট্ নাম্বার" "দি প্রোগ্রেস অফ্ হিউম্যানিটি" ইত্যাদি কতকগুলি যুক্তিসাপেক্ষ সংস্কারের উপর মানুষের সমগ্র ধর্ম ও কর্ম-নীতির প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও অদম্য প্রশ্নকে নিরস্ত করিবার কোনো উপায় দেখা যায় না। কারণ এই সকল সূত্রকে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলেই প্রশ্ন ওঠে, "কল্যাণ কি?"

"গুড কি?" "প্রোগ্রেস কি?" এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই চিরপুরাতন প্রশ্ন আবার জাগিয়া উঠে। সকল ক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তা দ্বারে-দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে, "এ প্রশ্নের সমাধান কোথায়?" এবং বার-বার একই উত্তর পাইতেছে, "অন্বেষণ করিয়া দেখ।"

কোথায় অন্বেষণ করিব? কিসের অন্বেষণ করিব? অন্বেষণ তো নিরন্তরই চলিয়াছে কিন্তু আমাদের অন্বেষণ মূল প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে কই? বাস্তবিক আমাদের অন্বেষণ প্রশ্নেরই অন্বেষণ—প্রশ্নকে যখন ঠিক ধরিতে পারি তখন উত্তর পাইতে আর দেরি হয় না। মানুষের চিন্তা, মানুষের সাধনা, মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সকল প্রকার প্রয়াসের মধ্যে প্রশ্নটাকে বারবার নানাদিকে নানা বিচিত্ররূপে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। যাহার মধ্যে প্রশ্ন এরূপে জাগে তাহার নিকট অন্বেষণের একটা পথ খুলিয়া যায়, কিন্তু সে পথ যে দেখে নাই তাহার অন্বেষণ কেবল একটা অস্থির অনিশ্চিততার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়, "এই পাইলাম" "এই যে আলো" "এই আমার পথ" বলিয়া যেকোনো একটা অবান্তর আপাততৃপ্তিকর উপায় ও মীমাংসাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। সেই জন্যই আমাদের সাধনা পদে-পদেই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা চাই শাশ্বত আনন্দ, খুঁজি সংসারের সুখ, চাই জীবন্ত সত্য, খুঁজি শাস্ত্রবাণী ও পণ্ডিতের প্রমাণ, চাই জ্ঞান ভক্তি, খুঁজি কল্পনা ও ভাবুকতা। "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" কিন্তু যদি কোথাও ঠিক মতোই চাই এবং মনের মতোই পাই, তবেই কি প্রশ্নটা মিটিয়া যায়? আমরা অনেক সময়ে তাহাই মনে করি। প্রশ্ন যে সকল ক্ষেত্রেই সকল অবস্থাতেই বিচিত্ররূপী, অনন্তরূপী আমরা অনেক সময়েই তাহা ভুলিয়া যাই। যখন যেরূপ উত্তর পাই মনে করি "ইহাই শেষ উত্তর, ইহাই চরম মীমাংসা।" তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া প্রশ্নটাকে একেবারে ঝাড়িয়া মিটাইয়া ফেলিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন তাহাতে নিরস্ত হইবে কেন?

জীবন সমস্যার সহিত সংগ্রামে মানুষ সহজে পরাস্ত হইতে চায় না, কিন্তু পদে-পদেই সন্ধি করিতে চায়। মনকে ভুলাইবার মতো একটা কিছু পাইলেই, সন্দেহের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে একটু দাঁড়াইবার মতো স্থান দেখিলেই, মানুষ সেইখানে আসিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া চিরকালের মতো নিরুপদ্রবে বিশ্রাম করিতে

চায়। অনেক সময়েই মানুষ যতটা বিশ্বাস করিতে চায়, সন্দেহকে অতিক্রম করিয়া ততদূর যাইতে পারে না। অতর্ক-প্রতিষ্ঠ সত্যকে তর্ক-যুক্তির উপর দাঁড় করাইতে গিয়া ধরিবার ছুঁইবার মতো একটা নিশ্চিত জমি খুঁজিয়া পায় না। অথচ প্রাণের মধ্যে সত্যের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে, যে অব্যক্ত শক্তির টানে মানুষের নিরন্তর জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে, দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিতেছে, তাহাকেও এড়াইবার কোনো উপায় নাই সেইজন্য মানুষ সন্দেহাতীত সত্যকে না পাইয়া একটা যেমন-তেমন মনগড়া মীমাংসায় তৃপ্ত থাকিতে চাহিয়াছে, তাই মানুষ সত্যকে ছাড়িয়া, জ্ঞানকে ছাড়িয়া, যুক্তি হইতে কল্পনায়, কল্পনা হইতে রূপকে, রূপক হইতে তুচ্ছ ভাবুকতায় অবতরণ করে। কিন্তু সন্দেহের কবল হইতে খঞ্জ বিশ্বাস ও দুর্বল কল্পনাকে কে রক্ষা করিতে পারে? সত্য যখন স্বয়ং প্রাণের দ্বারে আঘাত করিতে থাকে, তখন সে কি বলিতে চায় তাহা না বুঝিলেও, সেই আঘাতকে উপেক্ষা করি কিরূপে? অথচ অপর দিকে আপাত-অজ্ঞাত সত্যের খাতিরে আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে অতিক্রম করাও সহজ নহে। সেইজন্য মানুষের চিন্তা ও কার্যে, বিচারবুদ্ধি ও কর্মজীবনে কেমন একটা বিরোধ যেন থাকিয়াই যায়, এবং এই বিরোধ হইতেই প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া ওঠে। একটা আপাত-বিরোধী দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়াই প্রশ্ন যুগে-যুগে দেশে-দেশে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। এক এবং অনেকের দ্বন্দ্ব, নিত্য ও অনিত্যের বিরোধ, ভিতর ও বাহির, জড় ও চেতন, আত্মা ও জগৎ ইত্যাদি ভেদকল্পনার অসামঞ্জস্য, এসকল একই প্রশ্নের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ।

মানুষের চিন্তা যেখানে বিশ্রাম করিতে চায়, তাহার জিজ্ঞাসা যেখানেই তৃপ্ত ও নিরস্ত হইতে চায়, বিরোধ সেইখানেই প্রবল হইয়া ওঠে, সেই-খানেই আবার নূতন সংগ্রাম জাগিয়া ওঠে। মানুষ যতবার বলিয়াছে, “দাস্ ফার এণ্ড নো ফারদার” এইখানেই আমার প্রশ্ন ও উত্তর, চাওয়া এবং পাওয়ার শেষ, ততবারই সে ঠকিয়াছে এবং ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে শেষ কোথাও নাই। গোড়ায় গিয়া না পৌঁছিলে শেষকে পাওয়া যায় না। আঘাতের পর আঘাত আসিয়া মানুষকে বারবার এই শিক্ষাই দেয়, “বিশ্রাম তোমার জন্য নয়, সত্যকে যে সাক্ষাৎভাবে, জীবন্তভাবে, সমগ্র-ভাবে পায় সেই কেবল বিশ্রাম করিতে জানে, “তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।” মানুষ একদিকে আপস করিতে যায়, সন্ধির প্রাচীর

তুলিয়া সন্দেহের তরঙ্গাঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চায়, আর একদিকে নূতনতর সন্দেহের বন্যা আসিয়া তাহার বাঁধ ভাঙিয়া তাহার কল্পনার ঘর-বাড়িকে একেবারে ডুবাইয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। মানুষের সমগ্র জীবন ও চিন্তার ইতিহাস এইরূপ সন্ধি ও বিদ্রোহ পরম্পরারই ইতিহাস।

আজকাল এইপ্রকার একটা বিরোধকে শিল্পজগতে আমরা বিশেষভাবে দেখিতে পাই। "শিল্পের মূল উৎস কোথায়?" "শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কিসে?" এইরূপ একটা প্রশ্ন মানুষের শিল্পসাধনার সঙ্গে চিরকালই জড়িত আছে। যেখানে মানুষ সৌন্দর্যবোধকেই শিল্পের উৎস বলিয়া বুঝিয়াছে, সেইখানেই সৌন্দর্যের সন্ধান পড়িয়া গিয়াছে, সৌন্দর্য-পিপাসু মানুষ শিল্পরচনার জন্য প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সৌন্দর্য চয়ন করিয়া বেড়াইয়াছে। সৌন্দর্যের আলোচনা, সৌন্দর্যের সাধনা, সৌন্দর্যের ধ্যান, আলোকের মহিমায় সৌন্দর্য, ছায়ার রহস্যে সৌন্দর্য, বর্ণের বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য, দেহের গঠনে সৌন্দর্য, প্রকৃতির নির্বাত গাম্ভীর্যে সৌন্দর্য, গতির মৃদুচঞ্চল ছন্দের মধ্যে সৌন্দর্য! এমনি করিয়া মানুষ বাহিরের সৌন্দর্যকে তন্ন-তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছে, সাধনের ভিতর দিয়া, অনুভূতির ভিতর দিয়া, গভীর যোগের ভিতর দিয়া, সৌন্দর্যের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো বিরাটভাবে তাহার সমগ্রতাকে, কখনো খণ্ড-খণ্ড করিয়া তাহার বিশেষ-বিশেষ প্রকাশকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্যকেও মানুষ নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে নাই। যাহাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনুভূতির দ্বারা পায়, তাহাকেও বুঝিতে গিয়া মানুষ তর্ক-বিচারের মারামারির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে আবার প্রশ্ন উঠিয়াছে, সৌন্দর্যকে এরূপ বাহিরে অন্বেষণ কর কেন? সৌন্দর্য কি বাহিরের জিনিস? "সৌন্দর্য" বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জিনিস কি এই সকল দৃশ্য পদার্থের গায়ে মাখানো থাকে যে তাহাকে খুঁটিয়া-খুঁটিয়া বাহির করিতে হইবে? তোমার অন্তরে যে সৌন্দর্যের আদর্শ রহিয়াছে, তাহাকেই বাহিরে প্রতিফলিত দেখিতেছি। অতএব প্রকৃতির বাহিরের চেহারা দেখিয়া ভুলিও না। তাহার রূপের দাস হইও না। অন্তরের মধ্যে যে সৌন্দর্যের ছাপ রহিয়াছে তাহাকেই চিনিতে শেখ, এবং তোমার শিল্পের মধ্যে দিয়া তাহাকেই পরিস্ফুট করিয়া তোল।

আপাতত মনে হইতে পারে বুঝি একটা ভালো মীমাংসা পাওয়া গেল,

কিন্তু ইহার মধ্যে সমন্বয়বাদী আসিয়া নূতন সুর ধরিলেন, “ভিতরই বা কি আর বাহিরই বা কি? যাহাকে ভিতর বল, আর যাহাকে বাহির বল, তাহাদের মধ্যে বিরোধই বা কোথায়? ভিতর হইতে বাহির, বাহির হইতে ভিতর, মানুষের সকল সাধনাই তো এই ভাবেই চলিয়া থাকে। বাহিরে যে সৌন্দর্য দেখ, অন্তরের আদর্শের সহিত তাহাকে মিলাইয়া লও, আবার অন্তরে যে অব্যক্ত সৌন্দর্য আছে বাহিরের রূপের মধ্যে তাহাকেই অন্বেষণ কর। বাহিরের রূপকে অন্তরের ভাবের দ্বারা বুঝিয়া, বুঝাইয়া দাও এবং অন্তরের ভাবকে বাহিরের রূপের মধ্যে দিয়া জগতের কাছে প্রকাশ কর। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে এই পরিচয়কে নিগূঢ় যোগে পরিণত করাই শিল্পীর সাধনা এবং সেই যোগপ্রসূত আনন্দ হইতেই তাহার শিল্পের উৎপত্তি।” মীমাংসাটা শুনিতে বেশ তৃপ্তিকর বোধ হয়, মানুষের মন সহজেই ইহাতে সায় দিতে চায়। কিন্তু কার্যত সর্বত্রই দেখা যায়, কেবল বিচারলব্ধ কোনো সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবনের কোনো প্রশ্ন, কোনো সমস্যারই মীমাংসা হয় না। মীমাংসাকে জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা আবার নূতন করিয়া অর্জন করিতে হয়, জ্ঞানের সিদ্ধান্তকে হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়।

মানুষ যতক্ষণ তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে হাতড়াইয়া সাধনার উৎসকে ধরিতে না পায়, যতক্ষণ সে আপনার শিল্পীরূপকে ঠিকমতো চিনিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার সাধনাকে নিরাপদ মনে করা চলে না। ততক্ষণ সে হয় উৎকট উৎকেন্দ্র স্বেচ্ছাচারিতার দাস হইয়া পড়ে, না হয় বিশেষত্ব-বর্জিত গতানুগতিকতার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। একবার কোনো বিশেষ শিল্প বিশেষ ফ্যাশান্, বিশেষ প্রথাতন্ত্রতার পিছনে ছুটিয়া যায়, আবার বিদ্রোহী হইয়া প্রথা, সংস্কার, ট্র্যাডিশন্ মাত্রকেই বন্ধন জ্ঞানে ভাঙিতে চায়। একবার শিশুর মতো, অন্ধের মতো নির্বিচারে বহিঃপ্রকৃতির অনুসরণ করে, আবার মুখ ফিরাইয়া প্রকৃতি-চর্চাকেই উচ্চশিল্পের অন্তরায় জ্ঞানে খড়্গহস্ত হইয়া ওঠে। শিল্প আজ হয়তো সাক্ষ্য দিতেছে, “সত্যকে রেখাবর্ণাদি দ্বারা তর্জমা করিলেই সত্যকে ব্যক্ত করা হয় না, রূপক ও অলঙ্কারের দ্বারা কন্‌ভেনশন্ ও সিম্বলিজম্‌এর ইঙ্গিতে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়। শিল্পের সত্য বাহিরের রূপে নয়—রূপের মধ্যে নিহিত অর্থগৌরবেই সত্য।” কিন্তু আজ সে যত জোরের সঙ্গেই একথা বলুক না কেন, কাল না হউক দুদিন বাদে তাহাকে এ সুর একবার বদলাইতেই হইবে, একবার

তাহাকে বলিতেই হইবে, "সত্য আপনার মহিমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাহার জন্য অলঙ্কার আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তাহাকে যেমন সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করি তেমনি সহজ সুন্দর স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ করিতে হয়। আমরা যে সেরূপ করিতে পারি না, ক্রমাগতই অলঙ্কার ও উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হই, তাহা আমাদেরই অক্ষমতা, প্রকাশের অক্ষমতা, ধারণার অক্ষমতা, ভাষার অক্ষমতা। উপমা খঞ্জশিল্পের যষ্টি, শিল্পের একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। সে যখন শিল্পে কাব্যে ও চিন্তারাজ্যে সর্বেসর্বা হইয়া সত্যের আসনে বসিতে চায়, তখন তাহাকে ঘাড় ধরিয়া একেবারে নামাইয়া দেওয়া উচিত। যাহাকে 'রূপ' বলি, 'বাহিরের সত্য' বলি, শিল্পের চক্ষেও সে সত্য এবং আদরণীয়, আপনার মহিমাতেই সত্য, কেবল শিল্পীর ব্যাখ্যার খাতিরে সত্য নয়। তাহাকে জানা, তাহার সাধনা করা, শিল্পীর পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য।"

এইরূপ দুইটা বিভিন্ন সুর শিল্পজগতে, শুধু শিল্পে কেন, সর্বত্রই থাকিয়া যায়, এবং এইরূপ থাকাই প্রয়োজন। কারণ এ উভয়ই সত্য, ঠিক সত্যকে ধরিতে পারিলে, তাহার মধ্যে এই দুই মীমাংসারই যথার্থ স্থান পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে কিউবিস্‌ট্‌, ফিউচারিস্‌ট্‌ প্রভৃতি কয়েকটি বিপ্লববাদী দল এইসকল খণ্ডতত্ত্বকে ভাঙিতে গিয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে একেবারে ঠিক সত্যটাকে, মূল প্রশ্নটাকে, বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, "সুন্দর, অসুন্দর আবার কি? শিল্পের রাজ্যে আবার আইন কানুন কি? অসত্য, অসুন্দর ইত্যাদি কল্পনা শুধু নিরর্থক কল্পনা মাত্র। মানুষ যখনই একটা কিছু বাহিরের জিনিস অনুসরণ করিতে চায়—তা সে প্রথাতন্ত্রতাই হোক আর রূপের সাধনাই হোক, আচার্যের উপদেশই হোক আর সৌন্দর্যনামধারী কুসংস্কারই হোক, তাহার উপর সর্ববাদীসম্মতির ছাপ থাকুক আর নাই থাকুক, এই অনুসরণই দাসত্ব, এই অনুসরণই বন্ধন। অতএব, সর্বপ্রথমে সাধনের মূলগত এই বন্ধনকে ভাঙ, সর্বপ্রকার সংস্কারের অনুসরণকে বর্জন কর। তোমার শিল্পের নিয়ম, তোমার ক্যাননস্‌ অফ আর্ট, তোমার সৌন্দর্যের সংস্কার, তোমার ট্র্যাডিশনের নজীর, তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, যেখানে তুমি দাসখত লিখিয়াছ, সব ভাঙিয়া কেবল বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখ। দেখিবে এই নির্মমতার মধ্যে হইতেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। কাহাকে অসুন্দর বলিয়া শিল্পরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে চাও? ওই অসুন্দরেরই তপস্যা করিয়া দেখ—'উই শ্যাল রেভ্‌ল

ইন আগ্‌লিনেস্‌, উই শ্যাল ট্র্যাম্প্‌ল্‌ অন দি বনডেজ অফ ফর্মস এ্যাণ্ড দি টিরানি অফ আইডিয়াস,' রূপের বন্ধন ও ভাবের অত্যাচার উভয়কেই পদদলিত করিয়া অসুন্দরের মতো হও। চিত্তকে সর্বসংস্কার বিমুক্ত করিয়া একেবারে নিরঙ্কুশভাবে ছাড়িয়া দাও, সে আপনাকে যথেচ্ছা প্রকাশ করুক।" শিল্পীর এই যে বিদ্রোহীমূর্তি, ইহার বিদ্রোহের আবরণ খসিলেই ইহার প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পাইবে। বিপ্লবালোড়িত পঙ্কিলতা যখন কাল-ক্রমে সাধনার স্থিরতার মধ্যে তলাইয়া যাইবে তখন এই বিপুল মন্থন ব্যাপারের মধ্য হইতে এই পরমতত্ত্ব আবির্ভূত হইবে, "আপনাকে প্রকাশ কর, আপনাকে প্রকাশিত হইতে দাও।" আপনাকে যে পরিমাণে পাইবে, আপনাকে যে পরিমাণে বিলাইয়া দিবে, তোমার শিল্পসাধনা, তোমার যে-কোনো সাধনা, সেই পরিমাণে সার্থক হইবে। বাহিরের আশ্রয় আশ্রয়ই নহে, বাহিরের উপদেশের উপর বাহিরের উদ্দীপনার উপর তোমার শেষ নির্ভর রাখিও না, অন্তরের প্রেরণাই তোমার নির্ভর। তোমার বিচিত্র অপূর্ণতার মধ্যেই তোমার পূর্ণরূপ সার্থকরূপ নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে বিকশিত হইতে দাও, তোমার সমস্ত লক্ষ্যহীন ব্যর্থতার মধ্যে "আদর্শরূপী" তুমি ছায়ার মতো ঘুরিতেছ, সেই আদর্শকে তোমার মধ্যে প্রকাশিত হইতে দাও।

শিল্পরাজ্যে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ মানুষের সকল প্রকার সাধনা ক্ষেত্রেই তাহার অন্বেষণের সকল প্রকার খুঁটিনাটির মধ্যে কতকগুলি বিপরীতমুখী অথচ পরস্পর সম্বন্ধে বিভিন্নধারা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে কখনো একটি কখনো অপরটি প্রবল হইয়া উঠিতে চায় এবং সেই সঙ্গে মানুষের জিজ্ঞাসাও মূল-প্রশ্নের একমাথা হইতে আরেক মাথায় ঘুরিয়া বেড়ায়। বাতাস গ্রহণ ও বাতাস মোচন এই দুই ব্যাপারের মিলনে যেমন শ্বাসকার্য সম্পূর্ণ হয়, সেইরূপ মানুষের অন্বেষণের সাফল্যের জন্য তাহার সকল জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা অন্তর্মুখী ও একটা বহির্মুখী ঝোঁক থাকা প্রয়োজন। একবার মানুষ জগৎ ব্যাপারের দিকে চাহিয়া বলে, "জগৎটা একরকম বোঝা গেল, কিন্তু যে বুঝিল সে কে? ইহার মধ্যে 'আমি' লোকটা দাঁড়ায় কোথায়?" আবার যখন নিজের দিকেই তাহার দৃষ্টি পড়ে তখন সে বলে, "আমি যে সব জানিতেছি, তাহা না হয় বুঝিলাম কিন্তু যাহাকে জানিতেছি সেটা কি এবং এই জানার অর্থই বা কি?"

বিজ্ঞানের চক্ষে প্রশ্নটা এইরূপ একটা জটিলতার মধ্য দিয়া দেখা

দিতেছে। বিজ্ঞানের অন্বেষণ এতকাল আত্মাকে ছাড়িয়া চৈতন্যকে ছাড়িয়া জগৎ-ব্যাপারের সন্ধানে জড়প্রবাহের পশ্চাতেই ছুটিয়াছে। তাহার মধ্যে আত্মাকে কোথায় স্থান দিবে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত তাহার কোনোরূপ কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই। বিজ্ঞান কেবল জগতের সাক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছে, "অতীতে এই পথে আসিয়াছি, বর্তমানে এই পথে চলিতেছি, এইভাবে জড়জগৎ আপনাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ বিচিত্র নিয়ম বন্ধনের ভিতর দিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ মুহূর্তে-মুহূর্তে আপনার ভবিতব্যকে গড়িয়া তুলিতেছে।" একের বিচিত্রলীলাকে বিচিত্ররূপে খণ্ডিত করিয়া দেখা এবং সেই বিচিত্র খণ্ডতাকে আবার জোড়া দিয়া অখণ্ড নিয়মের একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করাই বিজ্ঞানের সাধনা। কিন্তু এই সাধনার একটি সূত্রকে বিজ্ঞান আপনার সংগ্রামের দ্বারা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না। বিজ্ঞান আপনার আত্মশিবির ছাড়িয়া যুক্তিবিচারের অকাট্য অস্ত্রে ক্রমাগতই জগৎ-শৃঙ্খলার ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার ভিতরকার নিয়ম বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং দেশ-কাল, একত্ব-বহুত্ব, সত্তা শক্তি ও চৈতন্য, এই সপ্তরথীর সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া পদে-পদেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। আর সকলকে একরকম এড়ানো যায় কিন্তু ঐ যে ব্যূহের মুখে, ভিতর বাহিরের সন্ধিস্থলে চৈতন্যরূপী জয়দ্রথ বসিয়া আছেন, বিজ্ঞানের অস্ত্রে তো তাহার গায়ে কোনো দাগ পড়ে না। বিজ্ঞান নিজবলে আত্মার শিবিরে ফিরিবে কোন পথে?

যে দেশকালাশ্রিত পরিবর্তন-পরম্পরাকে আমরা সংসাররূপে জানিতেছি, বিজ্ঞান এই অবিরাম গতির পূর্বাপর কিছুই দেখিতে পায় না, তাহার মূলে একটা স্থিতিরূপ কেন্দ্রেরও কোনো সন্ধান পায় নাই। অথচ এই পরিবর্তন-স্রোতের মধ্যে নিত্য, আপনাতে-আপনি-স্থিত, একটা কিছু না থাকিলে সমস্ত গতিটাই একটা নিরর্থক ব্যাপার হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান এক সময়ে জড়পরমাণুর স্থায়িত্বের উপর নিত্যতার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। বিজ্ঞান বলিয়াছিল, "এই শক্তির বিচিত্র লীলার মধ্যে শক্তির কেন্দ্ররূপে, অনন্ত গতির অন্তর্নিহিত অনন্ত স্থিতিরূপে এই অজ্ঞাতজন্ম শাশ্বত পরমাণু বর্তমান। এই প্রবহমান নিত্য পরমাণুর বিচিত্র সংযোগ বিয়োগকেই আমরা জগৎ-ব্যাপাররূপে জানিতেছি।" কিন্তু বিজ্ঞান যে আপাতস্থায়িত্বকে নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা গতি শক্তির কোনোরূপ মীমাংসা পাই না। বিশেষত আজকাল পরমাণু

সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার মধ্যে একান্ত অনিত্যতার যে সকল প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে বিজ্ঞান তাহার পূর্বতন নিশ্চিন্ত ভরসা হারাইয়া, এখন কোনো কিছুকেই নিত্য বলিতে সাহস পায় না। গতির কেন্দ্রে পরমাণু, পরমাণুর মধ্যে সূক্ষ্মতর গতি, বিজ্ঞানের অন্বেষণ এইরূপ চক্রের মধ্যেই ঘুরিতেছে। একটা অন্ধ আবর্তের মধ্যে পড়িয়া বিজ্ঞান মূল প্রশ্নের আশেপাশেই ঘুরপাক খাইতেছে অথচ কোথাও প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে না। সুতরাং প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে, "শক্তির মূলে কে?" শক্তি-ব্যাপারটা গীতরই নামান্তর মাত্র, এই মুহূর্তে যাহা এখানে পরমুহূর্তে তাহা ওখানে—এইরূপ কালভেদে জড়ের দেশভেদের নামই গতি। সুতরাং অনেকের মতে শক্তি তেমন একটা প্রশ্নের বিষয় নয়, জড়পদার্থের স্বরূপ লইয়াই আসল সমস্যা। কেহ বা বলেন, দেখা দরকার, শক্তি এবং জড় ইহাদের মধ্যে কাহার মূলে কে? অথবা ইহারা কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, না ইহাদের উভয়ের মূলে ইথার বা ইলেক্‌ট্রন্‌ বা অপর কোনো সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত আছে? আবার কেহ-কেহ প্রশ্নটাকে একেবারেই বাদ দিতে চান। তাঁহাদের মতে, একেবারে গোড়ায় গিয়া ঠেকিলে কোন জিনিস স্বরূপত কিরূপ দাঁড়ায় সে আলোচনা নিষ্ফল এবং অন্তত বিজ্ঞানের তরফ হইতে, সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার কোনো আবশ্যকতা দেখা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন যখন একবার উঠিয়াছে, তখন এরূপ উত্তরে মন প্রবোধ মানিবে কেন? যে শক্তির প্রেরণায় সৃষ্টিপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি, যে শক্তির নিরন্তর আঘাতে জীবন গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে যতক্ষণ লক্ষ্য-হীন অন্ধপ্রবাহরূপে জানিতেছি ততক্ষণ তাহার সঙ্গে কোনোরূপ আদান প্রদানের সম্বন্ধ কল্পনা করা চলে না। বলিতে হয়, প্রবহমান শক্তির মধ্যে এই অন্ধ সংঘাতের ফলে আমার জ্ঞান-শক্তিটুকু লইয়া আমি ভাঁসিয়া উঠিয়াছি, সে শক্তি জানিত না আমার মধ্যে সে কি অমূল্য সম্পদরূপে বিকশিত হইতেছে। সৃষ্টিবিকাশের আলোচনা করিতে গিয়া মানুষ যখন ক্রমোন্নতির কথা বলিতেছিল, বিজ্ঞান তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল, "উন্নতি নয়, পরিণতি।" অন্ধশক্তি আপনার মধ্যেই আপনাকে সংযত করিবার জন্য, আপনার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টায় অন্ধ সংগ্রামের দ্বারা আপনার সংঘাতে আপনি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে "অন্ধ" বলিতে না চাও আত্মপ্রণোদিত বল কিন্তু জ্ঞানপ্রসূত বা চৈতন্যময় বল

কেন? সে আপনার ঝুঁকিতে, আপনার অনিবার্য গতির প্রেরণায় অনিবার্য অজ্ঞাত পরিণতির দিকে ছুটিয়াছে, তুমি কেন তাহার উপর তোমার জ্ঞান, তোমার চিন্তা, তোমার অতৃপ্তি, তোমার ভবিষ্যতের আশাকে আরোপ করিতেছ? জগৎ-ব্যাপার কেবল বর্তমানকেই জানে, বর্তমানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সে অতীতের সোপান বাহিয়া আসিয়াছে এবং অতীতের ছাপ নিজদেহে ধারণ করিতেছে সত্য, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই সে অতীতকে ছাড়িয়া অতীতের বোঝাকে অতীতের সঞ্চয়কে, নূতন হইতে নূতনতর বর্তমানতার মধ্যে বহন করিয়া আনিতেছে। সুদূর পরিণতির কোনো সংবাদ সে রাখে না, প্রতিমুহূর্তের পরিণতিই তাহাকে পরমুহূর্তের পথ দেখাইয়া দিতেছে।

সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেখা যায়, যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে এবং কালে খণ্ডিত করিয়াও, সংযোগসূত্ররূপে সমগ্র খণ্ডতাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, এবং প্রতিমুহূর্তে এই প্রবাহের নিত্যতাকে রক্ষা করিতেছে, বিজ্ঞান এখনো জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার দ্বারে আঘাত করিয়া দেখে নাই। অথচ ইহারই মধ্যে বিজ্ঞানের সকল সাধনা সকল অন্বেষণের সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে জ্ঞানলক্ষণসম্পন্ন একটা অকাট্য প্রেরণা শক্তিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞান এই জ্ঞান বস্তুটাকে কোথাও ধরিতে চেষ্টা করে নাই। কারণ, বিজ্ঞান তো চৈতন্যকে খুঁজিতে আসে নাই, সে শক্তির নিয়মকেই খুঁজিয়াছে, এবং সেই জন্যই পদে-পদেই জীবন্তজ্ঞানের সাক্ষ্য পাইয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে।

আপনার মধ্যে যখন জ্ঞানকে অন্বেষণ করি, আপনার জ্ঞানের মধ্যে আপনার অন্বেষণের মধ্যে আপনার সত্ত্বারহস্যের মধ্যে যখন খুঁজিয়া দেখি, তখন তো জ্ঞানরূপী অখণ্ডতাকে দেখিতে পাই-ই, যে দেখিতে জানে সে বাহিরের দিক দিয়া, নিয়মের অন্বেষণ ও খণ্ডতার সাধনের মধ্য দিয়াও তাহাকে প্রচুর পরিমাণেই পায়। মানুষ বর্তমানের সঙ্গে খানিকটা অতীত ও খানিকটা ভবিষ্যৎকে সর্বদাই জুড়িয়া রাখিয়াছে। একদিকে সে আপনার অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও সংস্কারের দ্বারা তাহার প্রতিমুহূর্তের জীবনকে একটা ব্যাপকতা প্রদান করিতেছে, অপর দিকে তাহারই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্য জুড়িয়া দিয়া সে আপনার জ্ঞান ও চিন্তাকে আরো সুদূর অতীতের আভাস ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেছে।

বিলুপ্ত অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকে সে আপনার জ্ঞানের ভিতর দিয়া এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাঁধিয়া রাখিতেছে। শুধু কালের দিক দিয়া নয়, দেশের দিক দিয়াও দেখা যায় যে, কার্যত সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে দেহাত্মবাদী হইলেও পদে-পদেই আমরা এই শরীরকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, আমাদের চেতনা আমাদের প্রাণস্ফূর্তি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়া আমরা প্রতিমুহূর্তেই দেহের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করিয়া বহির্জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছি। বাহিরে যেমন আহার-নিশ্বাসাদির মধ্যে দিয়া জগতের সঙ্গে আদান প্রদান চলিয়াছে তেমনি চেতনার ভিতর দিয়াও নিরন্তর একটা বোঝাপড়া চলিয়াছে। শুধু যদি চোখটুকুকে আমার দর্শনেন্দ্রিয় মনে করি, তাহার সঙ্গে আদ্যোপান্তযোগযুক্ত "ইথার"-সমুদ্র ও জগৎব্যাপী আলোকতরঙ্গকে না দেখি, তবে ইন্দ্রিয় জিনিসটা একটা নিরর্থক ব্যাপার হইয়া পড়ে। টেলিগ্রাফের যন্ত্র হিসাবে শুধু সংবাদ গ্রাহক কলটুকু একটা কলই নহে, বিদ্যুৎপ্রবাহ ও সুদূরপ্রসারিত তার অথবা ইথার-বন্ধনকে ছাড়িয়া তাহার কোনো সার্থকতাই নাই। আলোকতরঙ্গ আমার চক্ষে আঘাত করিবামাত্র, চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া, সেই আলোককে আশ্রয় করিয়াই, দেহকে অতিক্রম করিয়া যায়—এই আলোক, এই বাহির, এই জগৎ, এই বৃক্ষলতা, এই সুদূর আকাশ, এইরূপ করিয়া প্রতি অনুভূতি প্রতি ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়া, চেতনা ছুটিয়া গিয়া জগতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনার মধ্যে টানিয়া আনে। এইরূপভাবে চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায়, এই একটা হস্তপদবিশিষ্ট জড় পিণ্ডই আমার শরীর নহে—ইহা আমার দেহের কেন্দ্রমাত্র, আসলে সমস্ত জগৎ নিখিলবিশ্ব আমারই বিরাট শরীর।

বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম জটিলতার মধ্যে মন যখন আপনার সম্যক্ দৃষ্টিকে হারাইয়া ফেলে, বাহিরের খণ্ডতার মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া যখন সে আর পথ খুঁজিয়া পায় না, তখন পরিশ্রান্ত মানুষ তাহার চিরন্তন প্রশ্নের বোঝাকে আপনার মধ্যে অন্তরের দ্বারে ফিরাইয়া আনে। এই যাওয়া এবং আসা যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন মানুষ আপনার মধ্যে প্রশ্নকে ও প্রশ্নের অন্তর্নিহিত সাম্যকে আবার যথার্থভাবে দেখিতে পায়। তখন মানুষ বুঝিতে পারে বাহিরের সাধনা দ্বারা যে "আমি"-কে আমরা অন্বেষণ করি, সে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়। বিবর্তনবাদের ভিতর দিয়া, জগতের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, মানব-ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার যে চেহারাকে

দেখিতে পাই, সে কেবল আমার একটা বাহিরের ছায়া মাত্র। এই ভ্রান্ত আমিত্বের সংস্কারকে আবার জ্ঞানের আঘাতে ভাঙিয়া দেখিতে হয়। আমি এই দেহ নই, এই দেহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তিবিশেষ নই, আমি এই প্রবহমান পরিবর্তন-পরম্পরা নই—

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে—

কেবল সেই আমিই আমি নই। এই সকল যাহার ছায়া আমি সেই সত্যবস্তু, আমার জীবনস্রোতের অনিত্যতার মধ্যে নিত্যরূপে আমিই বর্তমান, আমার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে আমি, আমার জীবনের মূলগত সুখ-দুঃখাতীত আনন্দের মধ্যে আমি—

যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি—

সেই আমিই প্রকৃত আমি। তাহাকে জানাই জীবনের প্রশ্ন, তাহাকে প্রকাশিত হইতে দেওয়াই জীবনের সাধনা, তাহার প্রকাশেই জীবনের সার্থকতা। জীবন যে-পথেই চলুক না কেন, যাহার সাধনা আপাতত যে-রূপেই হউক না কেন—কি ব্যক্তিগতভাবে কি জাতিগতভাবে, সকলকেই কোনো-না-কোনো দিক হইতে এই প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে।

প্রশ্ন কি আমাদের জীবনে উপস্থিত হয় নাই? সে কি আমাদের দেশে আমাদের' কাছে একটা উত্তরের দাবি করিতেছে না? কতবার, কতদিক হইতে, কত বিচিত্র রকমে, এ প্রশ্নের অন্বেষণ হইয়াছে, কত যুগে কতজন জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাধনার দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের জীবনের সমস্যা কোথায় মিটিয়াছে? অদম্য প্রশ্নের মীমাংসাকে সহজ করিবার জন্য, একটা পাকাপাকি মীমাংসা দ্বারা প্রশ্নের অস্থির তাড়নাকে নিরস্ত করিয়া মীমাংসাকে সমাজের অস্থি-মজ্জাগত করিয়া দিবার জন্য, মানুষ কত আচার, কত শাসন, কত নিয়ম-বন্ধনের মধ্যে মানুষকে বাঁধিয়াছে—কত স্থানে কত উপায়ে তাহাকে ঘাড়ে

ধরিয়া দাসখত লিখাইয়া লইয়াছে—দাসত্বের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তাহার চরম ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছে—মীমাংসার তাড়নায় প্রশ্নকে নির্বাপিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। এত বন্ধনে বাঁধিয়াছিল, খণ্ডতার এত প্রাচীর তুলিয়াছিল, তাই আজ প্রশ্নকে এত নির্দয় এত হিংস্ররূপে জাগিতে দেখিতেছি, তাই এত আঘাতের পর আঘাত আসিয়া এমন নিরুপায় করিয়া আমাদের বাঁধ ভাঙিতেছে। কিন্তু এই আঘাতই চরম সত্য নয়, এই বিদ্রোহই শেষ মীমাংসা নয়, ইহারই মধ্যে চিরন্তন প্রশ্নের শাশ্বত উত্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে, "আপনাকে অন্বেষণ কর, আপনাকে প্রকাশিত কর।" বাহিরের নিয়ম-সংস্কারের আকর্ষণ সমাজের কষাঘাতে অনেক চলিয়াছে; একবার অন্তরের আলোককে অন্বেষণ করিয়া দেখ, একবার তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া দেখ। ধর্মকে সহজ করিবার, লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টা অনেক হইয়াছে, একবার ধর্মকে জীবন্ত করিয়া দেখ। আমরা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ধর্মকেই আশ্রয় দিতে চাই, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াই মনে করি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিব। তাই আমাদের বিরোধ আর মিটিতে চায় না, আমাদের প্রশ্ন দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্বের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়।

অতীত গৌরবের জীর্ণ স্মৃতিকে রোমন্থন করিয়া মানুষ আর কতকাল তৃপ্ত থাকিতে পারে? কালের রথচক্র-নিষ্পেষণকে আর কতকাল উপেক্ষা করিতে পারে? আমরা চাই আর নাই চাই, ইচ্ছা করি আর নাই করি, অমোঘ প্রশ্ন যখন জাগ্রত হইয়াছে, সে যখন একবার এ পতিত জাতিকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "কে তুমি? কোথায় চলিয়াছ? কি তোমার করিবার ছিল? আর কি-ই-বা করিতেছ?" তখন সে আমাদের ঘাড়ে ধরিয়া, আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতাকে নিংড়াইয়া তাহার জবাব আদায় না করিয়া ছাড়িবে না।

দৈবেন দেয়ম্‌

....

সত্যিকার বাস্তব খবরের চাইতে অমূলক বাজার-গুজবের প্রতিপত্তি যেমন প্রবল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের তুলনায় অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টের মোহপ্রভাব তেমনি অনেক বেশি। স্পষ্টভাবে যাহাকে দেখি শুনি ও জানি, তাহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দুকথায় তাহার নাড়ীনক্ষত্রের হিসাব ফুরাইয়া যায়, কিন্তু যাহাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, সম্ভব-অসম্ভব নানা ডাল-পালায় পল্লবিত হইয়া সে মনের কল্পনাকে ভরাট করিয়া রাখে। তাই প্রত্যক্ষ আলোকের চাইতে অস্পষ্টতার আবছায়াই মনের মধ্যে অধিক সম্ভ্রমের সঞ্চার করে। স্পষ্ট শাসনের ভয়ে যে শিশু বিরত হয় না, সেও দেখি "জুজু" নামক অনির্দেশ্য পদার্থটিকে যথেষ্ট খাতির করিতে জানে।

এই অস্পষ্টতার আবরণ দিয়া মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নানারকম জুজু পুষিয়া থাকে। কতগুলি পরিচিত নাম বা দু-দশটা প্রচলিত বচনকে গাম্ভীর্যের মুখোশ পরাইয়া এমন বড়-বড় আসনে বসাইয়া রাখে যে তাহাদের সম্বন্ধে তর্কবিচারের চেষ্টাও বেয়াদবির নামান্তর বলিয়া গণ্য হয়। ব্রহ্মচর্যের অক্ষয়মাহাত্ম্য অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু বাল-বিধবার প্রবোধচ্ছলে সে মাহাত্ম্যের উচ্ছ্বসিত কীর্তন যে অনেক স্থলেই জুজু দেখাইবার আড়ম্বর মাত্র এরূপ সন্দেহ করা অসঙ্গত নয়। ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদ কিছু অবাস্তব কল্পনা নয়, কিন্তু সাত্ত্বিকতা ও আধ্যাত্মি-কতার বাহুল্য বর্ণনায় মন যে অকারণ সম্ভ্রমে ভরিয়া ওঠে, তাহা অনেক-স্থলেই নিছক জুজুতন্ত্রের নিদর্শন মাত্র। মোটকথা, অস্পষ্ট তত্ত্ব ও অনির্দিষ্ট সংস্কারকে যথাসম্ভব স্পষ্ট ও গম্ভীর ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহাতে অল্পায়াসে অনেকখানি ফল পাওয়া যায়। তর্কস্থলে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা যখন আবশ্যক হয়, তখন এইরূপ দু-একটি জুজুকে অকস্মাৎ আসরে নামাইলে, তাহার ফলটি হয় ঠিক চলন্ত রেলগাড়ির মুখে লালবাতি দেখাইবার অনুরূপ।

প্রবল তর্কের উৎসাহমুখে, "দিন আগে না রাত আগে?" বলিয়া সুকৌশলে একটি বিরাট সমস্যার অবতারণা করিলে, বেহিসাবী সাধারণ

লোকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিয়া বসে যে, ইহার পরে আর তর্ক চলে না। কিন্তু স্পষ্ট-বুদ্ধির সতর্কতা কোমর বাঁধিয়া বলে যে তর্কবিচার করিতে হয় তো এইখানেই করা দরকার। এইখানেই বিশেষভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন যে দিবারাত্রির এই আপাতভীষণ দ্বন্দ্বটা একটা নিতান্তই মোটা কৃত্রিম তর্ক মাত্র। দিন এবং রাত, ভিতর ও বাহিরের মতো, উত্তর ও দক্ষিণের মতো, কাগজের এপিঠ-ওপিঠের মতো, শাশ্বতকাল একই বাস্তব আইডিয়ার দুই মাথায় বসিয়া আছে। শাশ্বত কাল হইতে যেখানে-যেখানে সূর্য প্রদীপ্ত হইয়াছে, সেখানে-সেখানেই নানাছন্দে নানা বিচিত্র-তালে দিবারাত্রির যমজলীলার অভিনয় চলিয়াছে। এই পৃথিবীও যখন আপনার স্বতন্ত্রজীবনে প্রথম সূর্যালোক প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তখন হইতেই আলো-আঁধারের একই চক্রে দিবা-রাত্রি গণনার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেই-রূপ "বীজ আগে না গাছ আগে" এই প্রশ্নেরও একটা সম্মোহন মূর্তি আছে। শুনিলেই মনে হয় একটা বিরাট নিরুত্তর সমস্যা, তাই মানুষ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সতর্ক সহজ বুদ্ধি চোখে আঙুল দিয়া দেখায় যে জড় ও চেতনের সন্ধিমুখে জীবনের আদি উন্মেষ যেখানে, সেখানে বীজও নাই বৃক্ষও নাই, কেবল আকার বৈচিত্র্যহীন জীবকোষ পরিপুষ্টির আতিশয্যে ফাটিয়া দুখান হয়, "এক" সেখানে সাক্ষাৎভাবে "দুই" হইয়া বংশ বিস্তার করিতে থাকে। ক্রমে জীবন-রহস্যের জটিলতা যখন বাড়িয়া পরিণত ও অপরিণত জীবের প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া ওঠে, জীবাবস্থা ও বৃক্ষাবস্থার স্বাতন্ত্র্যকল্পনা যখন সম্ভব হয়, তখন সেই একই সম্ভাবনার যুগলচিত্র বৃক্ষ ও বীজের অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। দ্বন্দ্বটা যে কি এবং তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি কোথায়, এরূপ স্পষ্টভাবে ঘাঁটাইয়া না দেখিলে, তাহা যেকোনো ঝাপসা তর্কের ও নৈয়ায়িক আগাছার উর্বরক্ষেত্র হইয়া উঠিতে পারে। কার্যটা যেভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণের মধ্যে বীজাকারে নিহিত থাকে, বৃক্ষটা ঠিক সেইরূপ সূক্ষ্মভাবে বীজের মধ্যে "একাধারে" "অপ্রকট" থাকে কিনা, এবং বীজটা যদি উপাদান কারণ হয় তবে বৃক্ষের নিমিত্তকারণটা ঐ বৃক্ষবীজ-সম্বন্ধেরই অঙ্গীভূত কিনা, কার্য ও কারণ এবং বৃক্ষ ও বীজ, কৃতকর্ম ও অকৃতকর্ম এবং বাস্তব-বৃক্ষ ও বৃক্ষসম্ভাবনা ইহাদের পরস্পর নাম-সম্পর্ক কিরূপ, ইত্যাকার এ্যাবস্ট্রাক্‌শন বা অবস্তুর বিচার তখন সমস্যার চারদিকে জটিলতার জট পাকাইয়া তাহাকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখে।

এইরূপ ঝাপসা কথার ধোঁকা দিয়া মানুষ আপন মনে এক-একটা অস্পষ্টতার মোহ সৃজন করে, এবং সেই মোহকে জীবনের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া অকারণ তৃপ্তিবোধ করে। এই দুর্ভাগ্য দেশে, জীর্ণতার পরিত্যক্ত কঙ্কাল যেখানে প্রাণের চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, এই জুজুতন্ত্রের শাসনও এইখানেই মারাত্মকরূপে প্রবল। এ জিনিস যে অন্যদেশে নাই তাহা নয়, বাক্য ও চিন্তার ফেটিশ্ সকল দেশে সকল সমাজেই সুলভ। কিন্তু মোহের কবলে এমন নিশ্চেষ্ট নিরাশ্রয়ভাবে মানুষ আর কোথাও পড়িয়া থাকে না। লোকশাসন ও সমাজবিধির অপচার সর্বত্রই আছে কিন্তু তাহার এমন পাকাপাকি প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর আর সকলখানেই দুর্লভ।

ইংরেজিতে যাহাকে সুপারস্টিশন্ বলে, বাংলায় তাহারই নামান্তর করা হয় "কুসংস্কার।" ঐ জিনিসটার প্রতি কটাক্ষপাত নিবারণের জন্য একশ্রেণীর লোকে একটা বড় গোছের জুজু পুষিয়া থাকেন, তাহার মন্ত্র, "দেয়ার ইজ এ সুপারস্টিশন্ ইন এ্যাভয়ডিং সুপারস্টিশন্" অর্থাৎ কু-সংস্কার বর্জনের প্রয়াসটাও একটা কুসংস্কার। উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে, শুভাশুভ লক্ষণ-বিচারে, তিথিনক্ষত্রের নানা-উপদ্রবে, হাঁচি-টিক-টিকি আসন-মুদ্রার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে যে জিনিসটার জাল-বিস্তার হইতে দেখি, তাহাকে কুসংস্কার বলিলে অনেকে রাগ করেন। বলেন, "তুমি কি এমনই দিগ্‌গজ ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছ যে কিসে কি হয় না হয়, সমস্ত জানিয়া শেষ করিয়াছ? বিজ্ঞানের কয়েকটা পুঁথি আওড়াইয়া তুমি কি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্ব একেবারে দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিয়া ফেলিয়াছ?" ইহার পালটা জবাব দেওয়া যায় যে, "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে তোমার অন্ধ আচারের কোনো বন্ধন না মানিয়াও সহজ স্বাধীনভাবে কত দেশ কত জাতি সংসারে তরিয়া গেল, আর তোমার জটিল নিয়মের বিরাট প্রশস্তি যুগযুগান্ত জপিয়া-জপিয়াও 'তুমি যেই তিমিরে সেই তিমিরে।' তাই সন্দেহ হয় যে আধ্যাত্মিক জীবন-পুষ্টির খাতিরে তুমি যে সূক্ষ্ম আহারের অভিনয় করিতেছ, তাহা ফাঁকা রোমন্থন মাত্র।" কিন্তু ইহাতেও নূতন তর্ক জুটিবে যে সত্য-সত্যই আর কোনো জাতি অগ্রসর হইতেছে কিনা এবং আমরাও যথার্থই পশ্চাতে পড়িয়া আছি কিনা, আর যাহাকে "তিমির" বলা হয় সেটাও কি যথার্থই তিমির, না স্নিগ্ধ আলোর আশ্চর্য প্রকার বিশেষ। এই প্রকার ধাঁধাঁচক্রে নিরুদ্দেশ ভ্রমণ আমাদের এমনই অভ্যাসগত যে, চক্রের ব্যূহভেদ করা যে আবশ্যক, একথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়। তাই অন্ধতার

গৌরব করিয়া মানুষ বলে, "সকল বিষয়ে অতি জাগ্রত হওয়াটা কিছু ভালো নয়, ওটা সাবধানতার বাড়াবাড়ি মাত্র। দেয়ার ইজ এ সুপারস্টিশন্ ইন এ্যাভয়ডিং সুপারস্টিশন্!" মনের এক-একটা অন্ধ সংস্কার নিশ্চিন্ত নিরীহভাবে জীবনের উৎসরূপে চাপিয়া বসে, সহজ ব্যাপার কথার পাকে জটিল হইয়া ওঠে, গভীর তত্ত্ব নিরর্থক মুখস্থ বুলির মতো বচনমাত্রে পরিণত হয় তাহাতে কাহারো আপত্তিও নাই অতৃপ্তিও নাই।

এইরূপে কতগুলি অস্পষ্ট ও অচিন্তিত সংস্কার যখন কথায় নিবদ্ধ হইয়া জীবনের ঘাড়ে চাপিয়া বসে তখন তাহার প্রভাব কতদূর মারাত্মক হইতে পারে তাহার সব চাইতে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের এই অদৃষ্টবাদ। এত-বড় সর্বগ্রাসী জুজু এদেশে বা কোনো দেশে আর দ্বিতীয় নাই। আকার ও প্রকারের প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে এই এক সংস্কারের মূঢ়তা এমন আশ্চর্য সম্পূর্ণ ভাবে জীবনের আট-ঘাট জুড়িয়া জীবনের হাড়ে-হাড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে যে, মনে হয় জীবনের সকল অভ্যাস বন্ধনকে আমূল উপড়াইয়া না ফেলিলে ইহার আর প্রতিষেধ হয় না। এই এক জিনিসের মোহপ্রভাব সমস্ত জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতার উপর এমন পাকা করিয়া আপন রঙের ছোপ ধরাইয়া দেয় যে জীবনের প্রবল স্রোত অবিশ্রান্ত ধুইলেও রঙের ঘোর ছুটিতে চায় না। তাই জীবন সংগ্রামের সহস্র তাড়নার মধ্যে নিশ্চেষ্ট মানুষ, সুখে হতাশ, দুঃখে হতাশ, বিচার নাই, উদ্যম নাই, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, আর বলে, "দৈবেন দেয়ম্।" দৈবে করায়, দৈবে ঘটায়, অদৃষ্টের ফেরে পাই, অদৃষ্টের ফেরে হারাই। কর্মবন্ধনের আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতেছি ফিরিতেছি, বাহির হইবার পথ দেখি না, কারণ বাহির হইবার পথ নাই। যদিবা মুহূর্তের উৎসাহে বলিয়া ফেলি যে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" কিন্তু সেই উদ্যোগী পুরুষটিকে এই উত্তম-পুরুষরূপে দেখিবার আগ্রহ নাই, থাকিলেও তাহার আয়োজন দেখি না। কেবল জীবনের নিরুদ্যম ভীরুতা, "দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষা বদন্তি" এই কথারই সত্যতা প্রমাণ করিতে থাকে।

দৈবেন দেয়ম্। দৈবে যাহা আনিয়া দেয়, ঘাড় পাতিয়া তাহাই লও। সে দৈব যে কে, সে যে কোথা হইতে কিরূপে দেয়, তাহা দৈবই জানে, তোমার আমার কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবার নাই। দৈবের অমোঘ চক্রে তুমি আমি কলকব্জার খুঁটিনাটিমাত্র, তোমার আমার সুখ দুঃখে, তোমার আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায়, নিয়তির চক্র টলিবে কেন? দৈবে হাসায়,

দৈবে কাঁদায়, নতুবা তুমি হাসিতেও জানো না কাঁদিতেও পার না, তুমি কেবল দ্রষ্টা মাত্র, দৈবকর্মের সাক্ষী মাত্র। দারিদ্র্যে দুর্ভিক্ষে লোক মরে, ব্যাধিতে দুশ্চিকিৎসায় লোক মরে, মানুষ তাহার কি করিবে? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, কপালে যদি মরণ থাকে, মরণ তবে আসিবেই। আগুন জ্বলিয়া ঘর যায়, বাড়ি যায়, কি করিব? দৈবের লিখন। আগুনের মধ্যে দু-কলসী জল ঢালিবার চেষ্টাও যেন দৈবের নিষিদ্ধ! আর দশজন যাহারা আমাদেরই মতো দৈবের অধীন, তাহারা দৈবশক্তি লাভ করে আর দৈববলে বলী হয়, দৈবের উপর আস্থা রাখিয়া সংগ্রাম করে, কেবল আমরাই এমন দুর্দৈবের দাস যে দৈবের চাপে আড়ষ্ট হইয়া একবার মাথা তুলিয়াও দেখিতে জানি না?

ইহার চাইতে মানুষ যদি চার্বাকের মতো বেপরোয়া নাস্তিক হইয়া বলিত, "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ," জীবনের মাশুল ষোলোআনা আদায় করিয়া লও। জীবনের পক্ষে তাহাও আশার কারণ হইত, অন্তত বোঝা যাইত যে প্রাণের আশা এখনো সে ছাড়ে নাই।

ফ্রি উইল ও ডেস্টিনীর দ্বন্দ্ব-সমস্যা সকল দেশেই আছে এবং ছিল, কিন্তু তাহাতে আর কোথাও এমন নিষ্ফলতার বিভীষিকা ও অবসাদের সৃষ্টি হয় নাই। তাহার কারণ এই যে দৈবের বিচার-তত্ত্বকে পাকা কথায় গাঁথিয়া সিস্টেম বা তন্ত্রে পরিণত করিয়া জীবনের ভিত্তিমূলে বসাইয়া দিবার এমন অর্গানাইজড্ ব্যূহবন্ধ আয়োজন আর কোথাও দেখা যায় না।

যে মোহ ভাঙিবার জন্য মোহমুদ্গরের সৃষ্টি, সে মোহ মানুষের ভাঙে নাই, কিন্তু আনাড়ির হাতে মুদ্গরের প্রয়োগ এখনো মারাত্মক। শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ভগবান শঙ্করাচার্যের শিক্ষা, আসলে যাহাই হউক, তাহার সংস্কারগত সহজমন্ত্র এই যে, "সংসারটা কিছুই নয়।" যাহা দেখি মিথ্যা দেখি, যাহা শুনি, তাহা মিথ্যা শুনি; তুমি আমি, এই জগৎসংসার এই ঘটনার পর ঘটনা, সব মিথ্যা সব মায়া। সুতরাং সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি? "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ইত্যাদি। আসল কথা, সংসারটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেল। যে কর্মজীবন চায় সে সংসারের হাটে কোলাহল করিয়া ফিরুক, যে মানুষের সঙ্গ চায় সে সংসারের হাহাকার বহন করিয়া মরুক; তুমি এসবের শৃঙ্খল ভাঙিয়া, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া, জগতের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া কর্মের জন্ম-জন্মান্তর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর।

কথাটা বলিলেই কাজটা সহজ হয় না কারণ সংসারটাকে "মায়া" বলিয়া উড়াইতে চাহিলেই সে সরিয়া দাঁড়ায় না বরং মায়াপুরীর যমদূত-গুলি ক্ষুধার আকারে ব্যাধির আকারে সংসারের নানা তাড়নার আকারে জীবনের কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করে কিন্তু কুতর্কের কণ্ঠরোধ করিবে কে?

তাহার উপর আবার কর্মবাদের জগদ্দলপাষাণভার। শাস্ত্রবচনের যথার্থ মীমাংসা শুনিবার উৎসাহ মানুষের নাই, তাই লৌকিক স্থূল-সিদ্ধান্তকেই ঋষিবাক্যের মুখোশ পরাইয়া মানুষ শাস্ত্রানুশাসনের নামে চালাইতে চায়। এই লৌকিক সংস্কার বলে যে কর্মবন্ধনে হাত পা বাঁধিয়া মানুষ সংসারে আসে। পূর্বজন্মের সুকৃত দুষ্কৃতের নাগপাশ এই জন্মের জীবনযাত্রাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। এই জন্মে এখন তুমি দুর্দশাভোগ করিতেছ তাহার মূলকারণ তোমার "পূর্বজন্মকৃতং পাপং।" পূর্বজন্মের কর্মফলবীজ তোমার মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে, তাই ইহজন্মের জীবনবৃক্ষে তাহারই অনুরূপ ফল ফলিবে। এ জন্মে কাঁঠাল খাইবার সাধ রাখ, তবে ও-জন্মে কুষ্মাণ্ডবীজ রোপণ করিয়াছিলে কেন? এ জন্মে শূদ্র হইয়াছ অথবা অস্পৃশ্য "পঞ্চম" হইয়া জন্মিয়াছ, সে তোমার কর্মফলের দোষ। তবে আর মাথা তুলিতে চাও কেন? অযথা আর্তনাদ কর কেন? সংসারে কেউ ছোট, কেউ বড়, ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়ম, কর্মফল অনুসারে সকলে যথাযোগ্য আসন পাইয়া থাকে। সুতরাং যে যেমন আছ তাহাতেই তৃপ্ত থাকিয়া সুবুদ্ধি মানুষের মতো আপন পথে নির্দ্বন্দ্ব থাক, তাহা হইলে সুকৃত সঞ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে পরজন্মে হয়তো উচ্চতর পদবী লাভ করিবে। (অবশ্য ব্রাহ্মণের আশীর্বাদটাও তোমার কর্মফল প্রসাদে।) এই ব্যাখ্যার আশ্বাসে মানুষ কি যে সান্ত্বনা পায় জানি না, কিন্তু যে বেচারা সান্ত্বনা মানে না, মানুষ তাহাকে হতভাগ্য বলে, সমাজ তাহাকে চোখ রাঙায়।

তারপর, ইহার সঙ্গে যখন প্রাকৃত জনের অচিন্তিত অদ্বৈতবাদ জুড়িয়া দেওয়া হয় তখন জীবনতরী তাহার ভরাডুবীর আয়োজন সম্পূর্ণ করে। যে অদ্বৈতবাদের শঙ্খনির্ঘোষে জাগ্রত হইয়া মানুষ আপনার মধ্যে বিশ্বপুরুষের বিরাটরূপকে প্রত্যক্ষ করে, যে অদ্বৈত বিবেক মুমূর্ষু মানুষকে আশ্বাস দেয় তুমি ক্ষুদ্র নও; তুমি সুখদুঃখের ও জন্মমৃত্যুর ক্রীড়নক মাত্র নও; তুমি স্বয়ং অমৃত, তুমি স্বরূপত সেই বিরাট, সেই—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—

সেই জীবন্ত অদ্বৈতবাদ, লৌকিক বুদ্ধির কবলে পড়িয়া যে জুজুর আকার ধারণ করে, তাহা যথার্থই মারাত্মক। এই শখের অদ্বৈতবাদ বলে, "ভেদ যখন কোথাও নাই, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সবই যখন একই আত্মার বহুধা প্রকাশ মাত্র, তুমি আমি বিষয় আশয় ইত্যাদির যখন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তখন ভালোমন্দের বিচার কেন? পাপপুণ্যের ও পঙ্কচন্দনের সংস্কার কেন? কর্মের কর্তা সেই একই আত্মা; সুতরাং কে কাহার অনিষ্ট করিবে, কে কাহার সম্মান করিবে? কে কাহাকে আশ্রয় দিবে, কে কাহাকে হনন করিবে? দোষগুণের দণ্ডপুরস্কার নিরর্থক, সমাজের শাসনবন্ধন নিরর্থক, মানুষের ধর্মভয় ও দায়িত্ববোধ নিরর্থক। কাজের মালিক যখন একজন, তখন তোমার পাপপুণ্যের ভাগী তুমিও যেমন, আমিও তেমন। আমার লাভও নাই ক্ষতিও নাই, কিছু করিলেও হয়, না করিলেও হয়; দশের ভাবনা ভাবিলেও হয়, না ভাবিলেও হয়; কারণ আমার কাজে ও অকাজে আমার কোনো কৃতিত্ব নাই।"

আশ্চর্য এই যে, এক সময়ে কর্মবন্ধন কাটিবার জন্যই মানুষ জাগ্রত ও সচেষ্ট হইয়া অদ্বৈত প্রতিষ্ঠার আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, দৈবের জন্ম-জন্মান্তর শাসন ঘুচাইবার জন্যই সংসারকে মায়ার কবল বলিয়া মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। অথচ কার্যকালে দেখি কেহ কাহারও বন্ধন খোলে না বরং পরস্পরে মিলিয়া পরম-বন্ধুভাবে বন্ধনকেই আঁকড়াইয়া বলে, "সংসারের চক্রে জীবনটা যেমন ভাবে ঘুরিতেছে; ঠিক তেমন ভাবেই ঘুরুক, তাহাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।" সাধারণ সংসারবুদ্ধির কাছে দৈববাদ ও কর্মবাদ, মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ মনের কোনো সুস্পষ্টচিন্তিত সিদ্ধান্ত নয়, কতগুলি নির্বিচার অন্ধসংস্কারের জুজু মাত্র। তাই আসলে তাহাদের অর্থ ও অভিপ্রায় কি, একথা ভাবিবার জন্য মানুষ কোনো তাগিদ অনুভব করে না। পরিচিত ব্যাপার সম্বন্ধে অতটা শ্রমস্বীকার অনাবশ্যক বাহুল্য বলিয়াই বোধ হয়। পরিচয়টা যে বস্তুপরিচয় নয়, শব্দের পরিচয় মাত্র, এ বোধটাও মনের কাছে স্পষ্ট হইয়া ওঠে না। মূঢ়তার প্রশ্ন আপন মনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া বলে, ইহার নাম শাস্ত্রবাণী, ইহার নাম মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ, ইহার নাম দৈববাদ ও কর্মফলবাদ।

অথচ আসলে তাহা অজ্ঞতার স্বগত উক্তিমাত্র। অন্ধতার কবলে পড়িয়া মায়াবাদ বলিল, "এখানে কিছু করিবার নাই," কর্মবাদ বলিল, "কিছু করিবার উপায় নাই," আর অদ্বৈতবাদ বলিল, "কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, করিয়া কিছু লাভ নাই।" আর তিনের সুর মিলাইয়া দৈববাদ গম্ভীর পরিহাস করিয়া বলিল, "কেহ কিছু করিও না, কারণ না করাটাই বুদ্ধিমানের কর্ম।"

এইখানে কেহ-কেহ তর্ক তোলেন যে, "ইহার মধ্যে কোনটা কার্য আর কোনটা কারণ? দৈববাদের শাসন-প্রভাবেই কি জীবনের সচেষ্ট সংগ্রাম মরিয়া যায়, না জীবনটা নিস্পৃহ নিরুদ্যম থাকে বলিয়াই সে দৈববাদের দাস হইয়া পড়ে?" বাস্তবিক এ প্রশ্নের মধ্যে কোনো দ্বৈধ নাই। মাতাল যে, মাতাল বলিয়াই সে মদের দাস হয় আর মদের দাস হইলেই সে পাকা-রকম মাতাল হইয়া পড়ে। মনের মধ্যে ঔদাসীন্যের অবসাদ থাকিলেই দৈব-বাদের প্রতিষ্ঠাভূমি পাকা হয়; আর, দৈববাদের পাকাপোক্ত প্রতিষ্ঠার উপরেই আশাহীন নির্জীবতার আসর জমে ভালো। চিন্তা ও কর্মের এই ভিশাস্ সার্ক্‌ল্ অভ্যাসের দুরন্ত চক্রে জীবনকে একবার প্রবিষ্ট করিলে আর নিষ্ক্রমণের পথ থাকে না। টাকায় যেমন টাকা আনে, দুর্বল মন কেবল দুর্বলতাই ডাকিয়া আনে। জীবনীশক্তি যাহার ম্লান হয়, ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে এবং ব্যাধির আক্রমণে পড়িলে জীবনীশক্তিও ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। সুতরাং এই আগে-পরের তর্কটা খুব সমীচীন তর্ক নয়, ইহা দিবারাত্রি ও বৃক্ষবীজের পরিচিত তর্কেরই প্রত্যাভাস মাত্র। একাডেমিক ডিস্‌কাশন্ বা বৈঠকী তর্কের আসরে এ আলোচনার সমাদর ঘটিতে পারে কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রয়োজন হিসাবে তর্কটা ফাঁকা তর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। রোগের চিকিৎসা করিতে বসিয়া চিকিৎসক এ ভাবনায় বিচলিত হইতে থাকেন না যে, রোগটাকে আগে মারিব না তাহার কারণ-গুলিকে আক্রমণ করিব; না রোগের পরিচয়-লক্ষণগুলিকে দাবাইয়া রাখিব। রোগীর ক্ষীণপ্রাণতা ও ব্যাধির প্রকোপ চিকিৎসকের কাছে একই সমস্যার দুই তরফ মাত্র।

"অদৃষ্ট" কথাটার একটা ইতিহাস আছে। কার্য-কারণের কতকটা শৃঙ্খল বেশ দেখা যায়, বোঝা যায়, তাহা দৃষ্ট; আর যাহা স্পষ্ট দেখা যায় না, যাহার হিসাব পাওয়া যায় না, তাহা অদৃষ্ট। সহজ তত্ত্বের এই সহজ সংস্কৃত পরিভাষা। ইহার সঙ্গে কোনো বাদ-পরিবাদের বা বিভীষিকার

সম্পর্কমাত্র নাই। অথচ এইযুগে অদৃষ্ট বলিতেই এমন আতঙ্ককে বুঝি যাহা জীবনের ঘাড়ে ভূতের মতো চাপিয়া থাকে। সে আমাদের মাথার উপর একটা জাগ্রত উভয়সঙ্কটরূপে সর্বদাই উদ্যত হইয়া আছে। দৈবের আজন্ম চাপে জীবনটাই অবসন্ন, কর্মবন্ধন কাটি কিরূপে? আর, কর্ম-বন্ধনে হাত পা বাঁধা, দৈবের বোঝা নামাই কিরূপে? এই প্যারাডক্স্-এর সৃষ্টি করিয়া কথার চরকী ঘুরাইয়া মানুষ বেশ আশ্চর্যরকম পরিতৃপ্ত থাকে।

এই বর্তমান যুগে দৈববাদের এক নূতন আশ্রয় জুটিয়াছে, তাহার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান তাহার বিষয়রাজ্যে যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পায়, সে নিয়মকে পুরাপুরি ও একতরফা স্বীকার করিলে, বাস্তবিক একটা দৈবতত্ত্বকেই স্বীকার করা হয়। এই বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ কার্যকারণের সকল সম্বন্ধকে অঙ্কের হিসাবে মিলাইয়া দেখায় যে, প্রত্যেক কার্য, প্রকারে ও পরিমাণে, উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসূত। প্রত্যেক কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের কার্যফল প্রসব করে। প্রত্যেক নির্দিষ্ট 'কজ্' হইতে নির্দিষ্ট 'এফেক্ট্' উৎপন্ন হয়, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই মুহূর্তে জড়জগতের যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্বমুহূর্তে অকাট্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্বমুহূর্তের কারণ সমষ্টি, যাহা এই মুহূর্তের কারণসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও তৎপূর্ব সময় হইতেই অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। এইরূপে এই শৃঙ্খলপরম্পরায় সুদূরতম অতীত হইতেই সুদূরতম ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এক অমোঘ শাসনে আবন্ধ রহিয়াছে, কোথাও চুলপ্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। প্রত্যেক জড়কণার প্রত্যেক পরমাণু কখন, কোন পথে, কেমন ভাবে চলিবে, শাশ্বত-কাল হইতে তাহা অকাট্য সঙ্কেতে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, কোথাও তাহার বিচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। বিশ্বসংসারে এই মুহূর্তে যাহা কিছু যেমন ভাবে আছে তাহার পরিপূর্ণ হিসাব যদি পাওয়া যাইত, তবে অতীত ও ভবিষ্যতের সমগ্র ইতিহাসকে অভ্রান্তভাবে তাহারই মধ্যে নিহিত দেখিতাম। দৈববাদ ইহার অতিরিক্ত আর কি বলিবে? অবশ্য বাহিরের জড়ব্যাপার লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। বাহিরের দৃষ্টি অবজেক্টিভ্ ভিশন্ তাহার বিচারের সম্বল। কিন্তু এই বাহিরের দৃষ্টিকে সে জীবনের অন্তররাজ্যেও প্রয়োগ করিতে চায়, জীবনের মধ্যেও তাহার নিয়মচক্রের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পায়। সে পূর্বজন্মের কর্মপ্রভাবকে দেখে না কিন্তু পূর্বপুরুষের সঞ্চিত

গ্লানি ও প্রসাদকে দেখে, ইহজন্মের প্রত্যক্ষ আবেষ্টনকে দেখে। জীবনকে সে হেরিডিটি এনভায়রনমেনট্-এর সাক্ষাৎ ফলসমষ্টিরূপে বিচার করে। ইহা বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক, তাহার এক তরফের বাণী। ইহারই সাধন পর্যায়ে দেখি বিজ্ঞানপ্রাণ জাতিমাত্রেরই জাগ্রত পুরুষকার-আবেষ্টনকে অতিক্রম করিবার জন্য মানুষের দুরন্ত সংগ্রাম, শিক্ষা ও সাধনাদ্বারা বাহিরের বিরুদ্ধশক্তিকে জয় করিবার অদম্য উৎসাহ। সুতরাং দৈবকে চূড়ান্তরূপে স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞান আপনার সাধন বলে তাহার বিষ-দাঁত ভাঙিয়া রাখে।

বিজ্ঞানের জুজু যখন টিকিতত্ত্ব ও গঙ্গাজল-মাহাত্ম্যের সমর্থনেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন দৈববাদ যে বিজ্ঞানের দোহাই দিবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের যথার্থ দরদ যেখানে আছে, সাক্ষাৎ জ্ঞানস্পৃহা যেখানে জাগ্রত, জীবন ও সংসার যেখানে কেবল মায়ার পরিহাস নয়, জীবন্ত প্রাণের উত্তাপ সেখানে দৈববাদের বীজকে ভর্জিত করিয়া ফেলে। জীবনের ভূমিতে উপ্ত হইয়া সে বীজ আর তাহার ডালপালা বিস্তার করিতে পারে না, অন্ধতত্ত্বের জটিলজালে জীবনকে অভিভূত করিতে পারে না।

জীবনের যেকোনো দ্বন্দ্ব জীবনের মধ্যেই আপনার সর্বোত্তম সমাধান লাভ করিয়া থাকে। কারণ, জীবনের একটা স্বতন্ত্র "লজিক" আছে, তাহা তত্ত্বের লজিককে চিরকালই অতিক্রম করিয়া চলে। দৈবের যে তত্ত্বরূপ তাহা ছাড়াও তাহার একটা পরিচিত জীবন্তরূপ আছে, সেই রূপটিকে অহরহ আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখি এবং তাহার মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের সহজ সমাধান পাই। দৈবের দ্বারাই যে দৈবের খণ্ডন হয়, কর্মের দ্বারাই যে কর্ম-বন্ধনের ছেদন হয় ইহা কেবল শাস্ত্রের বচন নয়, ইহা প্রত্যক্ষ জীবনেরও সাক্ষ্য।

রোগের বীজই রোগের প্রতিষেধক জুটাইয়া দেয়। জীবন্ত দেহের ব্যবস্থা এমন বিচিত্র যে রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাণশক্তি তাহার প্রতিষেধক (অ্যাণ্টিটক্সিন) সৃজন করিতে থাকে। এই ব্যাপারকে চিকিৎসার কাজে লাগাইয়া মানুষ রোগের কাছ হইতেই তাহার সাক্ষাৎ ঔষধ আদায় করিয়া লয়। ঠিক সেইরূপ, তত্ত্বের বাদপ্রতিবাদ ভুলিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, দৈবই দৈবের খণ্ডনসঙ্কেত স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেয়। তত্ত্বের বিচার যখন জীবনের মধ্যে পুরুষকারের কোনো

স্থান দেখে না, কোনো অর্থ খুঁজিয়া পায় না, জীবনের জাগ্রত পুরুষকার তখনো সংসারের তুচ্ছতম সাধনের মধ্যে আপনাকে পরিপূর্ণ সত্যরূপে অনুভব করিতে থাকে। "বাঘ আসিতেছে" শুনিলে অতি-বড় দৈববিৎ পণ্ডিতও পলায়নরূপ ব্যাকুল চেষ্টায় পৌরুষকর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রে বলে দৈব আছেন, তত্ত্ব বলে দৈব আছেন, বিজ্ঞান বলে দৈব আছেন, আর সহজ বুদ্ধিও সায় দিয়া বলিল যে "দৈব আছেন।" সমস্তই মানিলাম কিন্তু আমার অনুভূতিকে, আমার আমিত্বকে, আমার জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়া যে পুরুষকার আছেন, একথাটা অস্বীকার করি কিসের জোরে? অদৃষ্টের ভাবনা ভাবিতে গিয়া খামখা আমার প্রত্যক্ষ পুরুষকারকে খোয়াইয়া বসি কেন? দৈবও মানিব, পুরুষ-কারও মানিব—স্থূলবিচার বলে, এ কেমন স্ববিরুদ্ধ কথা! কিন্তু দৈবও আছেন পুরুষকারও আছেন এই তো জীবনের সহজ সাক্ষ্য। বিচার করিয়া দেখিলাম আমি কিছু করি না, আমি কিছু করিতে পারি না, সব করে দৈবে; অথচ জীবনে এই আবার প্রত্যক্ষ দেখি, এই আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, এই আমার শক্তি ও সংগ্রাম। এই আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার শক্তি ক্ষয় করিয়া বক্তৃতা লিখিলাম, এই এখন মনের শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই বক্তৃতা পাঠ করিতেছি, ইহার সফলতার সুখ আমার, ইহার ব্যর্থতার দুঃখ আমার। যে শক্তি আমাকে ভাবাইয়া আমার দ্বারা কবিতা লিখাইল, তাহাকে যে-নামই দেই না কেন, যে বস্তুটা "আমি, আমি" বলিতেছে তাহাকে কোন বুদ্ধিতে বলি যে, "তুমি কোথাকার কে? ইহার মধ্যে তুমি কেউ নও?"

তবে কি বলিব যে খানিকটা দৈবে করায়, আর খানিকটা পুরুষকার? জীবনের খানিকটা পৌরুষসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ আর খানিকটা দৈবসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ? তাহাতেই বা সমস্যা মিটিল কই? জড় ও চেতন সমগ্র জগৎ যদি একই অখণ্ড নিয়মসূত্রে গ্রথিত হয়, তবে পুরুষকারকে তাহার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করি কিরূপে? আর, নিয়মচক্রের অন্ধ নিষ্পেষণ যদি এড়াইতে না পারিলাম, তবে পুরুষকারের সার্থকতা কোথায়? অলঙ্ঘ্য দৈবই যদি সর্বস্ব হয়, তবে জীবনে-জীবনে পুরুষকারের এই অভিনয় কেন? পুরুষকারকে জাগ্রত করিয়া আবার তাহার কর্তৃত্ব লোপ করা হয় কেন?

তত্ত্বের আসন ছাড়িয়া প্রশ্ন যখন জীবনের ক্ষেত্রে জাগ্রত হয়, জীবন যখন আপনার মধ্যে উত্তরের অন্বেষণ করিয়া দেখে, তখনই দেখে দৈবের

আত্মসম্বৃত সম্মোহন মূর্তি। আর সে বাহিরের নিষ্ঠুর শক্তিমাত্র নয়, অন্ধ-শক্তির নির্মম পরিহাস নয়। জীবনে-জীবনে পুরুষকাররূপে, হৃদয়ে-হৃদয়ে অমোঘ প্রেরণারূপে, কালে-কালে জাগ্রতমঙ্গলরূপে, দেশে-দেশে প্রবুদ্ধ আত্মবিশ্বাসরূপে সেই এক দৈবই আবির্ভূত। কোথাও দ্বন্দ্ব নাই, কোথাও বিরোধ নাই, ভিতরে বাহিরে একশক্তির জীবন্তলীলা প্রতি জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার বিরাটরূপকে আপনি প্রকাশ করিতেছে। প্রতি-জীবনের বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে আপনাকে আপনি সন্ধান করিতেছে, বিশ্বশক্তিকে আত্মশক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

যেকোনো দিক দিয়াই জীবনের পথকে উন্মুক্ত করি না কেন, জ্ঞানের অন্বেষণই হউক কি প্রেমের চরিতার্থতাই হউক, জীবনের জাগ্রতবুদ্ধি যেখানে আপনার জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করে, সকল দ্বন্দ্বের সকল সন্দেহের মোহরূপ সেখানেই খসিয়া যায়। স্বভাবশঙ্কিত দুর্বল মন দৈবের স্পষ্টরূপকে না দেখিয়াই আপস করিতে চায়; জীবনকে বিশ্বজীবনের মধ্যে, আত্মশক্তিকে বিশ্বশক্তির মধ্যে বৃহত্তররূপে দর্শন করে না। পুরুষ-কারকে সে অবতীর্ণ দৈবশক্তিরূপে জানে না তাই দৈব সেই বাহিরের নিষ্ঠুর বিভীষিকাই থাকিয়া যায়। দৈব তাহার জীবনের সুখ-দুঃখ সংগ্রাম আর বহন করিতে চায় না, কেবল দুঃস্বপ্নের মতো নিদ্রিত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে মাত্র। মিথ্যা ভয়ের মোহকল্পনা বিস্তার করিয়া মানুষ বলে, "আমার স্বাধীন বুদ্ধিকে দৈবশক্তির প্রকাশ বলিলে, আমার কর্তৃত্ববোধ থাকে কোথায়? আমার দায়িত্বজ্ঞান টিকিবে কিরূপে? অতটা স্বীকার করিলে মানুষ যে নিরঙ্কুশ বেপরোয়া হইয়া পাপ-পুণ্যের বিচার ছাড়িয়া দিবে, বিধাতার উপর আপনার দুষ্কৃতভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে!"

এই তো তত্ত্বতন্ত্রের জুজু! এই বিশ্বজীবন যদি এমন নিয়মেই গঠিত হয় যে সত্যকে সত্যরূপে দেখিতে গেলে মানুষের পৌরুষবুদ্ধিকে খোয়াইতে হয়, তবে সে সত্যবঞ্চিত অক্ষম পৌরুষ আমার কোন কর্মে লাগিবে? আর কোন পৌরুষকে আশ্রয় করিয়া মানুষ সত্যের অনশ্বর শাস্ত্রকে বিলুপ্ত করিবে? দৈবকে ফাঁকি দিয়া এড়াইবার কল্পনা পুরুষ-কারের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবারই চেষ্টা মাত্র। দৈবের বিশ্ব-বিস্তৃত শাসনতন্ত্র জীবনের ভিতরে-বাহিরে জাগ্রত রহিয়াছে, সে আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই। দৈব যদি সহায় না থাকে, তবে দৈবের কবল হইতে কে মানুষকে উদ্ধার করিবে? পুরুষকারকে যখন আশ্রয় করিতে

যাই, তখন দৈবের উপরেই আস্থা রাখি, নতুবা পুরুষকার দাঁড়ায় কোথায়? দৈব আমার অদৃষ্ট কল্যাণ, দৈব আমার পুরুষকার, দৈব আমার সাধন-বল, দৈব আমার কৃপাসম্বল। দৈবকে যখন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না তখন পুরুষকারকেও বিশ্বাস করিতে জানি না। মিথ্যাসংস্কার ও অন্ধ অভ্যাসের মোহ ভাঙিয়া দেখি, দৈবের শাসন কি অপূর্ব বিধান। বাহিরের প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলরূপে যে দৈব, সমাজের বিধিবিধানরূপে সেই দৈব, জীবনের সম্পর্কবন্ধনরূপে সেই দৈব। দেশের যুগসঞ্চিত কলঙ্কভার ও অবসাদের মধ্যে যে দৈব, সুপ্তোত্থিত জাতির জীবনপিপাসার মধ্যে সেই দৈব। পরমাণুর তাণ্ডবের মধ্যে সংহত শক্তিরূপে যে দৈব, জীবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রশান্ত সংযমরূপে সেই দৈব। যে দৈব হতভাগ্যের সহস্রকণ্ঠে বলাইতে থাকে, "মানুষের কোনো কর্তৃত্ব নাই, আত্মার কোনো স্বাধীনতা নাই," সেই দৈবই ক্ষুধার তাড়নায়, দারিদ্র্যের তাড়নায়, দয়ার তাড়নায়, প্রেমের তাড়নায় মানুষের পুরুষকারকে ও দায়িত্ববোধকে অজস্রভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখে।

মিথ্যাদৈবের অন্ধসংস্কারে মানুষ ডুবিয়া আছে, আগে তাহার মোহ-সংস্কার ভাঙিয়া দেখ, আগে জীবনকে এই অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার কর, তারপর জিজ্ঞাসা করিও, কে তাহার আচ্ছন্ন জীবনকে বন্ধন-বিমুক্ত করিবে, বিকৃতদৈবের কবল হইতে কে মানুষের পুরুষকারকে জাগাইয়া তুলিবে?

দৈবের অভয়মূর্তি যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দৈব যাহার মধ্যে আত্মশক্তির সার্থক বিরাটরূপে অনুভূত হইয়াছে, দৈবের জীবন্ত প্রেরণা যাহার পুরুষ-কারকে জাগ্রতরূপে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারই অন্তর্নিহিত দৈবশক্তি মুক্তির মোহনমন্ত্রে তাহার কণ্ঠের বাণী হইতে, তাহার সেবার অক্লান্তি হইতে, তাহার জীবনের পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য হইতে, মুক্তপবনরূপে অবতীর্ণ হইবে। যুগে-যুগে দৈবের আহ্বান বহন করিয়া দৈবের প্রতিনিধি সেইসব মানুষ আসিয়াছে, সেইসব মানুষ আসিতেছে, আরো আসিবে, যাহারা দৈবকেই পুরুষকারের সাক্ষী করিয়া, দ্বিধাহীন পরিপূর্ণ সাহসের অভয় বাণী শুনাইয়া বলিবে, "দৈবেন দেয়ম্।"

৪ শিল্পে অত্যুক্তি । ফটোগ্রাফী । ভারতীয় চিত্রশিল্প

শিল্পে অত্যুক্তি

আমাদের চোখ যাহা দেখে, আর মন যাহা দেখে, এই দুইটার মধ্যে অনেক প্রভেদ। মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে আপনার খাতায় জমা করে, তখন তাহার উপর যথেচ্ছা কলম চালাইতে সে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। তাহার নিজের ভালোলাগা-না-লাগার খাতিরে সে কত অবান্তর জিনিসকে বড় করিয়া তোলে, কত বড় জিনিসকে বিনা বিচারে হয়তো অজ্ঞাতসারে বাদ দিয়া বসে। এই গ্রহণ বর্জনের মধ্যে কোনো নিয়মসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া অনেকস্থলেই দুষ্কর।

আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের সংবাদ দেয়। বাহির হইতে আলোচনা করিয়া দেখিলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এগুলি সমস্তই স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া ঠেকে, কিন্তু মনের মধ্যে এই সমস্ত মিলিয়া যখন একটা অখণ্ড 'রসমূর্তি'তে পরিণত হয়, তখন তাহার মধ্যে কতখানি চাক্ষুষ, কতটা শ্রুত, আর কতটা অন্য কিছুর প্রতিধ্বনি, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কথাটা কাহারো নিকট হঠাৎ অদ্ভুত শুনাইতে পারে, তাই একটা সামান্য উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করুন সূর্যাস্তের কথা। সূর্যাস্ত যে দেখিতেছে, অনেকগুলি খণ্ড-খণ্ড ছবি মিলিয়া তবে তাহার মনে সূর্যাস্তের একটা পরিপূর্ণ ছবি অঙ্কিত হইতেছে। যেমন, একটা অগ্নিগোলক ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া দিগন্তরেখার তলে ডুবিয়া গেল, তাহার আভায় আকাশের নীলিমা হইতে নগরের ধূলিধূসর কুয়াশা পর্যন্ত সোনার সিঁদুরে অপরূপ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, রৌদ্রাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে গাছের দিগন্তোন্মুখ ছায়াগুলি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আলো ও ছায়ার দ্বন্দ্বকে লুপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল, এবং সকলের শেষে রজনীর অন্ধকার নামিয়া সারাদিনের রৌদ্রক্ষত পৃথিবীর শেষ রক্তরেখাটুকু পর্যন্ত মুছিয়া দিল। ইহার মধ্যে রাখাল কখন যে তাহার গোরুর পালকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল বা পাখি কুলায়লাভের জন্য যে-যার পথে চলিয়া গেল, সেদিকে হয়তো বিশেষভাবে চোখ নাও পড়িতে পারে, কিন্তু তথাপি মনে হয় বিশ্রামলাভের আকাঙ্ক্ষাটা যেন

প্রকৃতির মনকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, অন্ধকারের অবসাদ বৃক্ষ-পত্রে বাতাসে চারিদিকে সংক্রামিত হইয়া একটা অলস ঔদাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মনের মধ্যে যে স্ফুট-অস্ফুট এতগুলি ছবি জাগিয়া ওঠে, তাহার মধ্যে কতটা যে দেখিয়াছি, আর কতটা যে শুনিয়াছি, আর কতটা দেখি নাই শুনি নাই অথচ স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তাহা বলা শক্ত; অথচ ইহার কোনোটাকে যদি বাদ দিতে যাই তবেই হয়তো আমার মনের ছবিটিতে অনেকটা ফাঁক পড়িয়া যায়। যদি পাখির গৃহপ্রয়াণের সংগীতটুকু না থাকে, যদি জীবজগতের অস্ফুট শব্দোন্মেষের স্থলে একেবারে জনতার কোলাহল বা মরুপর্বতের নিস্তব্ধতা কল্পনা করি, তবেই আমার মনের ছবি আর সে-ছবি থাকে না।

প্রকৃতির কোনো একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করিয়াই যদি শিল্পী মনে করেন "যথেষ্ট হইল" তবে অনেকস্থলেই তাঁহার বলাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিল্পী এটি বেশ অনুভব করেন যে, তাঁহার চোখ তাঁহাকে যেটুকু দেখায়, কেবল সেইটুকুই ঠিক তদ্বৎ করিয়া আঁকিলেই তাঁহার মনের কথাটাকে ঠিক বলা হয় না। আবার শিল্পীর মাত্রাজ্ঞান যখন মুখ্যগৌণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে "চার কড়ায় একগণ্ডা" "বারো ইঞ্চিতে একফুট" এরূপ হিসাব ধরিয়া চলে না। সুতরাং জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, শিল্পীর মন তাহার ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলিকে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট "আদর্শের" অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া লয়। এই-খানেই শিল্পঘটিত প্রায় সকল প্রকার সত্য ও মিথ্যা অত্যুক্তির মূল বলা যাইতে পারে।

"সূর্যাস্ত জিনিসটা একটা রঙের খেলা মাত্র" কোনো শিল্পী এইকথা বলায়, ইংরেজ শিল্পী ব্লেক আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি স্পষ্টই দেখিতে পাই, আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে স্বর্গের জয়-জয় সংগীত উত্থিত হইয়া চতুর্দিক ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।" ব্লেক অনেকের নিকট অক্ষম শিল্পী বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু সেই "অক্ষমতার" মধ্যেই তিনি তাঁহার সরল প্রাণটির এমন পরিচয় দিয়াছেন যে সেই জিনিসটিকে পাইবার জন্য অনেক শক্তিমান্ শিল্পী শক্তির বিনিময়ে তাঁহার অক্ষমতাকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্লেক্ যদি তাঁহার সান্ধ্যচিত্রে একটা অপার্থিব জয়োচ্ছ্বাসের ছবি আঁকিতেন সেটা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইত না। কিন্তু আমিও যদি দেখাদেখি আবার লাল নীল আকাশের মধ্যে বীণা-

শুদ্ধ গুটি দু-চার পরীর অবতারণা করি, তবেই সমঝদার লোকে আমার কান ধরিয়া শিল্পের আসর হইতে নামাইয়া দিবে।

আর একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর একই দৃশ্যের মধ্যে রৌদ্র, বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতি অবস্থা-বিপর্যয়ের কয়েকটি ধারাবাহিক চিত্র দেখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে সন্ধ্যার একটি চিত্র আছে, হঠাৎ দেখিলে সেটিকে অন্য কোনো দৃশ্যের চিত্র বলিয়া ভ্রম হয়। আসলে দৃশ্য সেই একই, কিন্তু এখানে সম্মুখের গাছগুলিকে খাটো করিয়া আকাশের আলো হইতে নিচের অন্ধকারে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন চিত্রকর গাছগুলিকে একটা অসম্ভব রকম উচ্চস্থান হইতে দেখিতেছেন। কোনো সমালোচক ইহার ব্যাখ্যা করেন এই যে, চিত্র বলিতেছে, মানুষের মনটা যেন পার্থিব তুচ্ছতার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এক্ষেত্রে এরূপ "অত্যুক্তির" আরো গূঢ় কারণ দেখা যায়। আকাশের দিগন্তশায়ী মেঘস্তরের আলম্বিত শান্তভাব ও নিম্নে পাহাড় ও উপত্যকার সহজ সুন্দর গড়ানে টানগুলি মিলিয়া চিত্রে এমন একটি মৃদু দোলায়মান রেখাছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে যে, সন্ধ্যার বিশ্রামোন্মুখ ভাবটি আপনা হইতেই মনে জাগিয়া ওঠে। মনে হয় সংগ্রাম কলুষিত দিবসের পঙ্কিলতা যেন এমনি করিয়াই সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্যে স্তরে-স্তরে নামিয়া যায়। ইহার মধ্যে হইতে গাছগুলি যদি সঙ্গীনের মতো অতিমাত্রায় খাড়া হইয়া উঠিত, তবে সেই উদ্ধত রেখাসংঘাতে সমস্ত ছন্দটিকে একেবারে মাটি করিয়া দিত। সুতরাং এস্থলে শিল্পীর মনের ভাবটিকে রক্ষা করিতে হইলে এরূপ একটা "মিথ্যা"র আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। শিল্পের হিসাবে অত্যুক্তিটা যথার্থ ভাবসঙ্গত সুতরাং এক্ষেত্রে সত্য-সঙ্গত।

অজ্ঞতাবশত আনাড়ি শিল্পী প্রাকৃতিক সত্যের যে-সকল অপলাপ করিয়া থাকেন, বা ব্যঙ্গচিত্রে ইচ্ছাপূর্বক যে-সকল অত্যুক্তির অবতারণা করা হয় সেগুলি বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু বাস্তবিকতার একটা বিকৃত আদর্শের কল্যাণে মাঝে-মাঝে শিল্প-বাজারে যে এক শ্রেণীর নাটকীয় অত্যুক্তির আমদানী হইয়া থাকে, তাহার সহিত আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিচিত। নিজের অন্তর্দৃষ্টির উপর যে শিল্পীর বড় একটা আস্থা নাই, পাছে তাহার বক্তব্যটি সর্বজনসুবোধ্য না হয়, এই আশঙ্কায় সে তাহার কথাগুলিকে অতিমাত্রায় স্পষ্টোচ্চারিত করিয়া অজস্র ইঙ্গিত ও ভঙ্গীবাহুল্যের আটঘাট এমন করিয়া বাঁধিয়া দেয় যে, শিল্পরঙ্গভূমির

প্রশংসাবাদীগণের মনে আর অণুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইহার দু-একটি পরিচিত নমুনা দিলে ভালো হইত, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সে দুঃসাহসিক কার্যে বিরত থাকিলাম। আমাদের দেশে এই জাতীয় অত্যুক্তির প্রসারের জন্য পাশ্চাত্যশিল্পকে দায়ী করাটা ঠিক ন্যায়সংগত হয় না। কারণ ইহার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য জগতে বিরল না হইলেও, পাশ্চাত্য বাস্তব শিল্পের দোহাই দিয়া আমাদের দেশে সাধারণত যে জিনিসটার চর্চা হইয়া থাকে, সেটা পাশ্চাত্যও নয় বাস্তবও নয় এবং অধিকাংশ স্থলে শিল্প নামেরও যোগ্য নয়। অতিরিক্ত কথা বলাটাও এক প্রকারের অত্যুক্তি এবং কাব্যের ন্যায় শিল্পেও তাহা নিন্দনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া, অত্যুক্তি বলিলেই কিছু বাক্যের অসংগত বাহুল্য বুঝায় না। অত্যুক্তি জিনিসটাও যে শিল্পসংগত হইতে পারে, এ কথাটা আর কয়েক বৎসর পূর্বেও এদেশের মাসিক পত্রের পাঠকগণকে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক হইত। কেন হইত তাহা জানি না, কারণ কাব্যে সাহিত্যে অত্যুক্তির ছড়াছড়িতে আমরা তো বেশ অভ্যস্ত আছি।

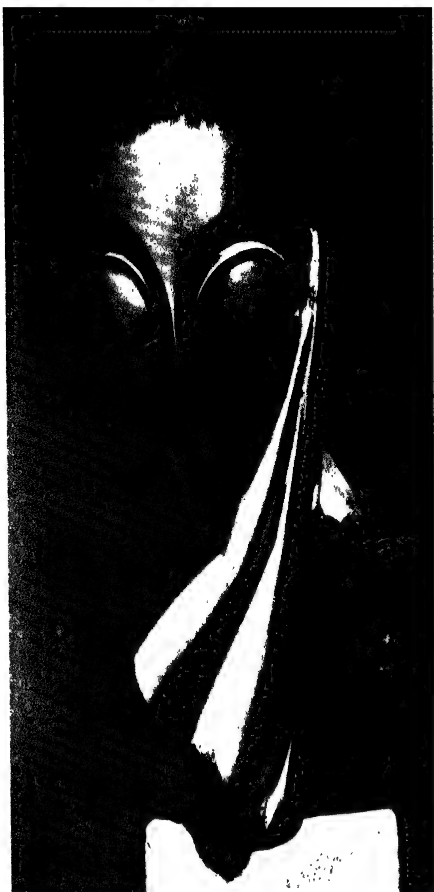
শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলি যখন নিতান্ত অভ্যস্ত ও "মামুলী" হইয়া আসে, তখন তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে যে সকল নব্যতন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা অত্যুক্তির ধুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যুক্তির বাড়াবাড়িটা কতদূর গড়াইলে তবে তাহাকে অসংগত বলা চলে এ প্রশ্নের খুব একটা সোজাসুজি মীমাংসা হয় না। কিন্তু অনেক প্রকার অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক অতিস্পষ্ট অত্যুক্তির মূলে প্রায়ই একটা আদর্শ-বিপর্যয় লক্ষিত হয়। শিল্পী তাঁহার মনের ভাবকেই যথাসংগত ভাষায় ব্যক্ত করিবেন, এই অত্যন্ত সহজ কথাটিকেই টানিয়া ফেনাইয়া অতিরিক্ত ব্যাপক করিয়া তুলিলে কথাটা নিতান্তই উদ্ভট হইয়া পড়ে। ভাব জিনিসটা যখন বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টায় প্রকৃতির সহিত একটা অর্থহীন কলহ বাধাইয়া বসে, তখনই তাহাকে কিছুকালের জন্য শিল্প-রাজ্য হইতে নির্বাসন দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে অত্যুক্তি-মূলক ভাবব্যঞ্জনা-পদ্ধতিকে আমরা প্রাচ্যশিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে দেখিতে পাই, সেই জিনিসটার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ঘটিলে তাহা কতদূর উৎকট ও অসংগত হইতে পারে, তাহারই নমুনা স্বরূপ ব্রাঙ্কুসি নামক রুমানীয়ার শিল্পীর রচিত একটি মূর্তির ছবি দেওয়া গেল। (১ নম্বর চিত্র দ্রষ্টব্য) এই রমণীমূর্তির ভীষণায়ত দৃষ্টির কল্পনায় নাকি বিশেষভাবে অন্ত-

দৃষ্টির গভীরতা ও স্পষ্টতা সূচিত হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পের ইতিহাস বিশেষত আজকালকার পাশ্চাত্য "অত্যুক্তিমূলক" শিল্পের ইতিহাস, আলোচনা করিলে আমরা এই একটা তত্ত্ব লাভ করি যে, অত্যুক্তি জিনিসটা যে কোনো সূত্র অবলম্বন করিয়াই শিল্পে প্রশ্রয়লাভ করুক না কেন, সে অনেক সময়ে ছুঁচটি হইয়া প্রবেশ করে বটে কিন্তু পরিণামে প্রায়ই ফালটি হইয়া বাহির হয়।

ক্লড্ টার্নার প্রভৃতি শিল্পীগণ নিষ্ঠার সহিত আলোকরহস্যের চর্চা করিয়া শিল্পে একটা নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা নানাপ্রকার অত্যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন এবং রাস্কিন্ সেই সূক্ষ্ম অত্যুক্তির আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে টার্নারের "অত্যুক্তি"গুলিই সর্বাপেক্ষা সত্যসংগত এবং সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক। এই আলোক-সৌন্দর্যের কুহকে পড়িয়া পরবর্তীযুগের বর্ণোপাসকগণ, "কেবল মাত্র আলোক ও বর্ণবৈচিত্র্যের সাধনাতেই উচ্চতম শিল্পপ্রতিভা সার্থকতা লাভ করিতে পারে" এইরূপ একটা ধুয়া তুলিয়া বস্তুনিরপেক্ষ আলোকতত্ত্বের সন্ধানে আপনাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ইঁহাদের চক্ষে প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রেই কতগুলি অপরূপ বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ মাত্র। নীলিমার গম্ভীর সুর কেমন করিয়া অবাধে ও অলক্ষিতে রক্তিমতায় আরোহণ করে এবং খণ্ড আলোকের ছন্দ কেমন করিয়া তাহার নিরবচ্ছিন্নতাকে ভাঙিয়াও ভাঙে না—প্রতিদিন সূর্যের উদয়ে ও অস্তগমনে ইঁহারা এই শিক্ষাই লাভ করেন। শিল্প চিরকাল এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, কোনো বস্তুর "রূপ" বলিতে তাহার বর্ণের চাইতে তাহার আকৃতিটাকেই বেশি বুঝায়, কারণ আকৃতিটাই বিশেষভাবে তাহার প্রকৃতির পরিচায়ক। সুতরাং বর্ণ জিনিসটা বহুকাল ধরিয়া কেবলমাত্র আকৃতি প্রকাশের সহায়তার জন্যই ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার যে একটা নিজস্ব মূল্য ও বিশেষত্ব আছে একথা লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং বর্ণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শিল্পী যে বস্তুর আকারগত রূপটাকে উড়াইয়া বসিবেন, ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য হইবার কোনো কারণ নাই, প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মই এই। বর্ণগত অত্যুক্তির মাত্রা বাড়িতে-বাড়িতে শেষটায় এই সিদ্ধান্তে আসিয়া ঠেকিল যে, "যেহেতু বিজ্ঞান বলেন যে, চোখের মধ্যে কয়েকটা মৌলিকবর্ণের পাশা-পাশি সমাবেশকেই আমরা আলোকরূপে প্রত্যক্ষ করি, অতএব আলোককে সম্যকরূপে ব্যক্ত করিতে হইলে উক্ত কয়েকটি মৌলিকবর্ণের বিন্দু-বিন্দু

প্রয়োগ ভিন্ন সত্যসঙ্গত আর কোনো উপায় নাই।" কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য না হইলেও একদল শিল্পী এই "আদর্শ" অনুসারে, লাল, নীল, হলুদের ছোট-বড় ফুটকির মধ্যে শাদা কালো মিশাইয়া শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। একটা উৎকট মতানুবর্তিতার খাতিরে অকারণ শক্তিক্ষয়ের এমন আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আর বড় দেখা যায় না।

ফটোগ্রাফ জিনিসটাকে সত্যনিষ্ঠার চূড়ান্ত নিদর্শন জ্ঞানে অনেকে তাহাকে খুব একটা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন। কিন্তু বাস্তবিক অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে সত্যের বিকৃতিসাধনে ফটোগ্রাফ বড় কম পটু নহে। তা ছাড়া, তাহার ছোট-বড়-জ্ঞানশূন্য নির্বিচার দৃষ্টিতে "মুড়ি মুড়কি একদর" হইয়া যে অসঙ্গতি ঘটায়, সেটিও বড় সামান্য নহে। ফটোগ্রাফ-বর্ণিত কোনো ব্যাপারের ছবিতে তাহার একটা সাময়িক অবস্থা-মাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যে জিনিস স্থির থাকে না, যাহা মুহূর্তে-মুহূর্তে পরিবর্তমান, তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে রীতিমতো সিনেম্যা-টোগ্রাফের প্রয়োজন। এস্থলে শিল্পীর কর্তব্য কি? তিনিও কি ফটো-গ্রাফের অনুকরণে গতির ছন্দকে একটা ক্ষণিক আড়ষ্ট সংহত ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করিবেন? দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার পরিবর্তন পর্যায়-গুলিকে তো আমরা স্বতন্ত্র করিয়া দেখি না, মোটের উপর একটা গতি-প্রবাহ উপলব্ধি করি মাত্র। যে উপায়ে এই গতির প্রবাহ ও ছন্দকে সম্যক-রূপে ব্যক্ত করা যায় তাহাই গতি সূচনার প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহা অতি পুরাতন সর্ববাদীসম্মত কথা, কিন্তু কথাটাকে সকলে ঠিক একভাবে বা এক অর্থে গ্রহণ করে না। একটা ঘোড়া ছুটিতেছে, আমি দর্শক, তাহার চার-পায়ের ওঠা-নামা, সঙ্কোচন-প্রসারণ এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দেহের সম্মুখীনগতিরূপ একটা প্রকাণ্ড জটিল ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু ঠিক কোন মুহূর্তে কোন কার্যটি কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার একটা চাক্ষুষ হিসাব রাখা অসম্ভব, আর সে হিসাব পাইলেও কোনো বিশেষমুহূর্তের দেহাবস্থানের দ্বারা গতির জটিল ছন্দটি সম্যক সূচিত না হওয়াই সম্ভব। নৃত্য, গীত, বাদ্য, আহার, বিহার, প্রহার, বক্তৃতা, পলায়ন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যের এক-একটা নিজস্ব ছন্দ ও রূপ আছে। সাধারণভাবে আমরা ইহাই বুঝি যে, যে প্রকার দেহভঙ্গী বা অঙ্গ-বিন্যাসের দ্বারা এই ছন্দটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয় চিত্রে তাহাই প্রযোজ্য। আধুনিক অত্যুক্তিবাদী ইহার উপর নিজের এই টিপ্পনী যোগ করিয়াছেন



১ এই মূর্তিটি একটি জীবন্ত সুন্দরীব। শিল্পী ব্রাঙ্কুসি এই মূর্তিতে সুন্দরীর আঁখির গভীর দৃষ্টি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।





২ নৃত্যসভা (উপরে)। এই চিত্রে শিল্পী সেভেরিনি একটি নাচের মজলিসে বহু নরনারীর লাস্যগতির চঞ্চলতা ও সদাপরিবর্তমান অবস্থান পরম্পরা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

৩ বিপ্লববাদী গ্যালির শ্মশানযাত্রা (ডাইনে)। এই চিত্রে শিল্পী কার্লো কারা ভীষণ বর্বরীয় মহিমান্বিত কল্পনায় এক বিপ্লববাদীর মৃত্যুর পরও যে বিপ্লবের জড় মরে না তাহাই প্রকাশ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

৪ গত রজনীর স্মৃতি (ডাইনে উপরে)। শিল্পী রুসোলো এই চিত্রে গত রজনীতে পথ চলিতে চলিতে নানারূপের চকিত-দৃষ্ট দৃশ্যপরম্পরার যে মিশ্র চিত্র মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মাঝে-মাঝে উঁকি মারে তাহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন — একখানি রমণী-মুখ, একটা ভাকড়া গাড়ির বেতো ঘোড়া, একটা মোটরগাড়ির দ্রুত ঘূর্ণিত চক্র, একটি রমণীর [illegible] কটি একখানি হাত, একটা শ্রান্ত শীর্ণ নগ্ন ভিক্ষুক প্রভৃতি।





৫ বেহালাবাদক কুর্বেলিকের প্রতিকৃতি। শিল্পী পাবলো পিকাসোর চোখে যেমন লাগিয়াছে।

যে, "গতির ছন্দকে ব্যক্ত করিতে হইলে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অসম্ভব বিক্ষেপ বা দেহবিচ্যুতি পর্যন্ত ঘটানো আবশ্যক হয়, তবে তাহাও শিল্প সংগত বলিতে হইবে। আর, দুই-চারিটা অতিরিক্ত হস্তপদ যোজনা করিলে যদি কথাটা আরো সুব্যক্ত হয়, তবে তাহাতেই বা বিরত থাকিব কেন?"

এই সকল কথা কেবল সম্প্রদায় বিশেষের "মত" মাত্র নহে। "ফিউচারিস্ট" নামধারী শিল্পীগণ হাতে কলমে ইহার সমস্তই করিয়া দেখাইতেছেন। এই ফিউচারিস্‌ম্‌ বা ভবিষ্যবাদ একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যদ্বাদীগণ শিল্পের সকল প্রকার নিয়ম-কানুন ও বাঁধাবুলিকে এবং অতীতের সকল প্রকার সংস্কার ও বন্ধনকে আবর্জনা জ্ঞান করিয়া থাকেন। সৌন্দর্য বল, শৃঙ্খলা বল, সুরুচি বল, এ সমস্তেরই মধ্যে একটা নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যের আনুগত্য দেখা যায়। এ উপদ্রব নাই কেবল জীবনসংগ্রামে এবং জীবনের মূলগত অকাট্য সত্যের নির্ভীক অনুসরণে, কারণ প্রাণশক্তি সেখানে কৃত্রিমতার বন্ধন ছাড়িয়া আপনার প্রেরণায় আপনার অতীতকে অতিক্রম করিয়া আসিতেছে! ভবিষ্যদ্বাদী যাহাকে "জীবন-সংগ্রাম" বলেন তাহা কেবল জীবনের অন্তর্নিহিত একটি গূঢ় শক্তির উচ্ছ্বাস মাত্র নহে, তাঁহার মতে বাহিরের বিরোধ, যুদ্ধ বিদ্রোহ, বাণিজ্যের স্বার্থ সংঘাত, শক্তির উদ্ধত অভিমান, লৌহকঙ্কাল সভ্যতার স্পর্ধা ইহারাই বর্তমান যুগে জীবন প্রসারের শ্রেষ্ঠতম মূর্ত পরিচয়! সুতরাং পুরাতন সংস্কারের চর্বিতচর্বণ ও মামুলী ভাবরসিকতার পুনরুক্তি করিয়া আর অরুচির মাত্রা বাড়াইও না। অস্ত্রের ঝঞ্চনা, বিজ্ঞান বাণিজ্যের উদ্দাম ধূমোদ্গার ও সমাজ সংগ্রামের নির্মম গদ্যকে তোমার শিল্পেও বরণ করিয়া তাহাতে চিরনূতনত্বের সঞ্চার কর। কৃত্রিমতা আমাদের হাড়ে-হাড়ে, নতুবা শিল্পী তাঁহার ভাবপ্রকাশের জন্য আবার একটা "ব্যাকরণ" গড়িবেন কেন? তাঁহার মন যাহা দেখিল তাহাকে আবার চোখের দেখার সহিত মিলাইয়া সংযত করিয়া লইবেন কেন? আমাদের সকল কার্যের অর্থাৎ সকল প্রকার আত্মপ্রকাশের এক-একটা অব্যক্ত রূপ আছে। মনের কথাগুলি যতক্ষণ মনেই থাকে; ততক্ষণ অনর্থক ভাষায় তর্জমা করিয়া বা কর্তা কর্ম ক্রিয়াপদের পারম্পর্য রক্ষা করিয়া কেহ তাহাকে চিন্তা করে না। আমি তুমি, এখান সেখান, যাওয়া করা, ইত্যাদি মোটা-মোটা "আইডিয়া"গুলিই অবিচ্ছেদে মনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া অব্যক্ত চিন্তায় পরিণত হয়। যদি "ফিউচারিস্ট" হইতে চাও তবে

ঘটনামাত্রেই মনের মধ্যে যে সকল অস্ফুট ছাপ রাখিয়া যায়, তাহারই কয়েকটার খিচুড়ী বানাইয়া চিত্রপটে ছড়াইয়া দাও। সুতরাং আদর্শ, মত, বিষয় নির্বাচন ও রচনাপদ্ধতি সকল বিষয়ই ফিউচারিস্টের মৌলিকতা স্বীকার্য।

ফিউচারিস্ট অঙ্কিত নৃত্যামোদের চিত্রটিতে নৃত্য ব্যাপারটা একটা উদ্দাম-বিক্ষিপ্ত বর্ণচ্ছন্দে পরিণত হইয়াছে বটে কিন্তু কতকগুলি অর্থ-সংলগ্ন হস্তপদমুখাকৃতি অবয়বের ছড়াছড়িতে সমবেত নৃত্যভঙ্গীর রূপটি ফুটিয়াছে মন্দ নয় (২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। কোথাও বিশেষ কিছু নাই অথচ মনে হয়, হাত পা উঠিতেছে পড়িতেছে এবং সেই গতির হিল্লোল যেন সমস্ত চিত্রটিকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। "গ্যালীর শ্মশান-যাত্রা"র (৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) বিষয়টি ফিউচারিস্ট শিল্পীর ঠিক মনের মতো হইয়াছে। সূর্যাস্তের অগ্নিগর্ভ রক্তচক্ষু যেমন সূর্যদেবের বিদায়-কালেও তাঁহার বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখে এবং পৃথিবীকে শাসাইয়া যায় যে, রৌদ্রের কশাঘাতে সকলকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্য কাল আবার আসিব, সেই-রূপ বিপ্লববাদীর অন্তিমপ্রয়াণে একটা "মরিয়া না মরে রাম" গোছের ভাব দেখানো হইয়াছে। বিরুদ্ধ রেখাবর্ণের উদ্ধত সংঘাত এবং ঘূর্ণায়মান আলোকচক্রে ছায়ামূর্তিগুলির উল্লসিত তাণ্ডব নৃত্যে মৃত্যুর বিভীষিকাকে একটা বিজয়দৃপ্ত ঝঞ্জনার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। এখানে আমরা যাহা দেখিতেছি ইহা ভবিষ্য শিল্পের একটা অপেক্ষাকৃত সংযত রূপ। ইহার "পরিপূর্ণ"রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া অনর্থক পুঁথি বাড়াইবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। একই চিত্রের মধ্যে মানুষের চোখ, খানার টেবিল, তাসের আড্ডা, অন্ধকার পথ, মোটর গাড়ি প্রভৃতি অসংলগ্ন জিনিসের জট পাকাইয়া, তাহাকে, "গত রজনীর স্মৃতি" (৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) বলিতে ইঁহারা একটুকু ইতস্তত করেন না। কেহ আবার আপনার ভাবকে লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন, "নাগর-দোলায় আরূঢ় ব্যক্তির মনোভাব," "আক্রান্ত যোদ্ধার ভয়তুমুল ভাব," "দাঙ্গাকারী ভিড়ের সমষ্টিভূত ভাব," ইত্যাদি অনেক বিচিত্র "মনোভাবের" চর্চা ইঁহারা করিয়া থাকেন। এখন বাকি আছে "কটাহ-বিক্ষিপ্ত কইমাছের মনোভাব" ও "অর্ধ-পক্ক পাঁউরুটির মনোভাব।" অনেকে সন্দেহ করেন যে, কোনো-কোনো "ভবিষ্যৎ-শিল্পী" হয়তো এই ফাঁকে জগতের সঙ্গে বুজরুকী করিয়া একটা মস্ত রসিকতার চেষ্টায় আছেন।

কিন্তু অত্যুক্তি জিনিসটার চরম পরিণতি দেখিতে হইলে তথাকথিত কিউবিস্ট্ বা "চতুষ্কোণবাদীর" সংবাদ লওয়া উচিত। ইঁহাদের মতে অধমতম বাস্তব শিল্পী ও ভবিষ্যদ্বাদীর মধ্যে বড় বেশি তফাত নাই! ভবিষ্যদ্বাদী চাক্ষুষদৃশ্যের অনুকরণ না করিয়া একটা মানসরূপের অনুকরণ করেন, এইটুকুমাত্র তাঁহার মৌলিকতা। তাঁহার শিল্পসাধনায় এই "অব্যক্তরূপের" একান্ত বশ্যতা ও রেখা বর্ণাদির ঐকতানমূলক একটা সংস্কার তো স্পষ্টই দেখা যায়। যদি সত্যই সংস্কারবিমুক্ত হইতে হয়, তবে দৃষ্ট বা কল্পিত বস্তুর রূপকে এমন কিছু দ্বারা ব্যক্ত করা আবশ্যক, যাহার সহিত সেই বস্তুর আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত কোনোপ্রকার সাদৃশ্য নাই।

এইজন্য জীবদেহের সুগোল বর্তুলতাকে "কিউবিস্ট" কতগুলি সোজা রেখার আঁচড় ও একটানা বর্ণপ্রলেপে পরিণত করেন। রেখার উপর রেখা চাপাইয়া এক-একটি "কিউবিস্ট" চিত্রে ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদির যে জঙ্গল রচিত হয়, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে কোথাকার মানচিত্র বা ক্ষেত্রতত্ত্বের কোনো সিদ্ধান্ত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অসঙ্গত ঋজুতার টানে সকল ছন্দকে এবং রেখা ও গঠনের সৌন্দর্যজাত সকল সংস্কারকে একেবারে নির্মূল করিতে না পারিলে কিউবিস্ট নিশ্চিন্ত হন না। কারণ তিনি তো সভ্যতা-সঙ্গত শিল্পমাত্রেরই কৃত্রিম জটিলতাকে ভাঙিয়া শৈশবের সহজ রেখার অনাবিলতাকে আবার শিল্পের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চান। কথাগুলি শুনিতে যাহার কাছে যেমন লাগুক, কার্যত ইহার ফল কিরূপ দাঁড়ায় তাহার একটা নমুনা দেওয়া গেল (৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। চিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া কিউবিস্টশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সুতরাং চিত্র পরিচয়ের বৃথা চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

শেষ কথা এই যে, অত্যুক্তি জিনিসটা কোনো-না-কোনো আকারে শিল্পের মধ্যে থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মাথায় চড়িতে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। অবশ্য প্রত্যেকটি উক্তি সুসঙ্গত হইতেছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য মনের ভাবগুলিকে অহরহ অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে হইবে, এরূপ উপদেশ কেহ দেয় না, কিন্তু অত্যুক্তি জিনিসটা অত্যাচারে পরিণত না হউক, শিল্পীর মনে যদি এরূপ কোনো অভিপ্রায় থাকে, তবে ভাবের সঙ্গে বস্তুজ্ঞানের একটা পরিচয় ঘটানো আবশ্যক। আর, সর্বোপরি আবশ্যক আত্মনিষ্ঠা। শিল্পীর অন্য দোষগুণ

যাহাই থাকুক, এই জিনিসটি যদি থাকে, এবং যদি লোকে হাসিবে বা পাগল বলিবে এই ভয়ে তিনি আত্মগোপন না করেন, তবে তিনি আর কিছু লাভ করুন আর নাই করুন, আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক আনন্দ ও সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

ফটোগ্রাফী

....

কিছুদিন হইল বিলাতের ফটোগ্রাফী মহলে একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয়—ফটোগ্রাফী আদৌ 'আর্ট' বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা। প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হইল না, হওয়া সম্ভবও বোধ হয় না। চিত্ররচনার কোনো প্রক্রিয়াবিশেষ 'আর্ট'-পদবাচ্য কিনা, এ বিষয়ে আন্দোলন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তুলিকার সাহায্যে কাগজে রঙ লেপিয়া চিত্রাঙ্কন করা যায় কিন্তু এই রঙ লাগানো ব্যাপারটার মধ্যে 'আর্ট' আছে কিনা সেটা কেবল 'ফলেন পরিচীয়তে।' 'আর্ট' জিনিসটা তুলি কাগজ রঙ বা ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার মধ্যে থাকে না, শিল্পীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ ও ভাব-সম্পদেই তাহার জন্ম। শিল্পীর নিকট তুলি, পেন্সিল বা ফটোগ্রাফীর সরঞ্জাম শিল্পরচনার অর্থাৎ ভাবকে শিল্পরূপে প্রকাশ করিবার, যন্ত্র বা উপায় মাত্র। ভাব যতক্ষণ মৌন থাকে, যতক্ষণ তাহা রেখাবর্ণাদি দ্বারা ব্যক্ত না হইয়া ভাবরূপেই অন্তরে সঞ্চিত থাকে ততক্ষণ তাহাকে শিল্প বলা যায় না।

এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। তুলি পেন্সিল বা কলম শিল্পীর আয়ত্তাধীন, এগুলিকে শিল্পী রেখাঙ্কন ও বর্ণপ্রয়োগার্থ যথারুচি ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু ফটোগ্রাফীর লেন্স্ বা প্লেট তো তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনুগত নহে। অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত কেরামতির স্থান কোথায়? আপত্তিটার মূলে যুক্তিযুক্ততা রহিয়াছে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক 'আর্ট' হিসাবে ফটোগ্রাফীর ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ বলিতে হইবে।

'ফটোগ্রাফী' বলিতে সাধারণত দৃষ্টবস্তুর 'চেহারা তোলা' বোঝায়। ইহাই ফটোগ্রাফীর মূল কথা, অনেকের পক্ষে এখানেই তাহার চরম পরিণতি। ফটোগ্রাফীর প্রথম সোপানে উঠিয়াই আমরা নিরীহ আত্মীয়-স্বজনের মুখশ্রীকে অনায়ত্ত বিদ্যার পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করি এবং মনে করি ফটোগ্রাফীর চূড়ান্ত করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই আদিম অবস্থার উপরে ওঠা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া ওঠে না। কিন্তু যাঁহারা ইহার মধ্যে

উচ্চতর আদর্শের অনুসরণ করেন, তাঁহারা জানেন যে ফটোগ্রাফী বিদ্যার অনুশীলনে সৌন্দর্য চর্চার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যায়। 'সুন্দর' বস্তু বা দৃশ্যের যথাযথ ফটোগ্রাফ লইলেই তাহা 'সুন্দর' ফটোগ্রাফ হয় না। কারণ, আমাদের চোখের দেখা ও ফটোগ্রাফীর দেখায় অনেক প্রভেদ। জিনিসের গঠন ও আকৃতি ফটোগ্রাফে চাক্ষুষ প্রতিবিম্বেরই অনুরূপ হইলেও প্রাকৃতিক বর্ণবৈচিত্র্য ফটোগ্রাফে কেবল ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য মাত্রে অনূদিত হইয়া অনেক সময় ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সাধারণত হরিত পীতাদি উজ্জ্বল বর্ণ ফটোগ্রাফে অত্যন্ত ম্লান দেখা যায় এবং নীল ও নীলাভ বর্ণগুলি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং আকাশের নীলিমা ও মেঘের শুভ্রতা সাধারণত একই রূপ ধারণ করায় শাদা কাগজ হইতে তাহাদের পার্থক্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে প্রকৃতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল কারুকার্য সাধারণ ফটোগ্রাফে এক-ঘেয়ে কালির টানের মতো মিলাইয়া যায়। অবশ্য ফটোগ্রাফীর বর্তমান উন্নত অবস্থায় এ সকল দোষের সংশোধন অসম্ভব নহে এবং বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ফটোগ্রাফে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিবারও উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া আর একটি গুরুতর সমস্যা ও অন্তরায় রহিয়াছে। শিল্পী যখন প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য চয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি অনেক অবান্তর বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া চলেন, অনেক আনুষঙ্গিক অন্তরায়কে ত্যাগ করিয়া কেবল সৌন্দর্যটুকু আস্বাদ করেন। কিন্তু ফটো-গ্রাফীর নির্বিচার দৃষ্টিতে সুন্দরও নাই, অসুন্দরও নাই, আমার মন কত-টুকু চায় বা না চায় তাহার সহিত কোনো সম্পর্কই রাখে না সুতরাং তাহার পক্ষে নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব। এইজন্য ফটোগ্রাফের বিষয় নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা ও বিচার আবশ্যক এবং ফটোগ্রাফীর চক্ষে বিষয়টাকে কিরূপ দেখাইবে তাহাও জানা প্রয়োজন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আড়ম্বরে যদি শিল্পীর আসল বক্তব্যটাই চাপা পড়িয়া যায় তবে শিল্পের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে। সুতরাং চিত্রে মূল বিষয়গুলিকে যাহাতে যথাযথ প্রাধান্য দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিরূপ ভাবে কোনো স্থান হইতে ছবি তুলিলে দৃশ্যের প্রধান উপাদানগুলি সুসংস্থিত হয় অর্থাৎ তাহারা পরস্পর বিরোধের দ্বারা চিত্রকে খণ্ডিত না করিয়া একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আনয়নের

সহায়তা করে। কোন সময়ে, কিরূপ আলোকে ও অবস্থায় ফটো লইলে মূল বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, কিরূপে অনাবশ্যক বিষয়ের আতিশয্যকে দমন করা যায়, সেগুলিকে বর্জন করিয়া, ছায়ায় ফেলিয়া বা ফোকাস করিবার সময় স্পষ্টতার ইতর বিশেষ করিয়া অথবা অন্য কোনো উপায়ে কিরূপে তাহাদের প্রাধান্যকে সংযত করা যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে সম্যক বিচারশক্তি লাভ করা অনেক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ।

আমরা হাল্কাভাবে শিল্পচর্চা করি বলিয়াই শিল্প আমাদের আয়ত্ত হয় না। কেবল শিল্পের কথাই বা বলি কেন? বিজ্ঞান শতমুখে ফটো-গ্রাফীর ঋণ স্বীকার করিতেছে। বিজ্ঞানের এমন ক্ষেত্র নাই ফটোগ্রাফী যেখানে নূতন আলোক বিস্তার করে নাই, মানুষের জ্ঞানকে দৃঢ়তর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা করে নাই। ইহা কেবল অক্লান্ত উৎসাহ ও অনুরাগের ফল।

ভারতীয় চিত্রশিল্প

....

ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক আলোচনাদি হইয়া গিয়াছে। আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তেও শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টা-চরিত্র সত্ত্বেও আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের কাছে ব্যাপারটা আদৌ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে না। বিশেষত, ভারত-শিল্প প্রসঙ্গে গ্রীক ও অন্যান্য শিল্প প্রভৃতি নানা-বিষয়ের অবতারণা ও সমালোচনা করায় অবস্থাটা নিতান্তই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অর্ধেন্দ্রবাবু বা অপর কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যদি অনুগ্রহ করিয়া সহজ গদ্যে আমাদের আপত্তি ও সন্দেহাদির মীমাংসা করিয়া দেন তবে অনুগৃহীত হইব।

বোঝা গেল, ভারত শিল্পক্ষেত্রে বাস্তবিকতার কোনো সমাদর নাই। মক্ষিকাঘ্ন মসীজীবিবৎ দৃষ্টবস্তুর হুবহু অনুকরণ করিয়া যাওয়া ভারতীয় শিল্পের (শুধু ভারতীয় কেন, কোনো শিল্পেরই) উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় চিত্রশিল্পী প্রাকৃত ব্যাপারের কোনো ধার ধারেন না। তিনি "এনাটমি", "পার্সপেকটিভ" প্রভৃতি গ্রীকশিল্পের "ঠুলি" চোখে দিয়া শিল্পসাধনা করেন না। চিত্রাঙ্কনকালে, চিত্রের উপাখ্যান-বস্তুর বাস্তবিক আকৃতি কিরূপ, তাহার বর্ণ লাল, নীল, কি সবুজ, এ সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেওয়া তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। তিনি চিত্র-বর্ণিত বিষয়ের চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া মনশ্চক্ষে তাহার যেরূপ চেহারা দেখেন ঠিক তেমনটি করিয়া তাহাকে চিত্রিত করেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা তাঁহার কাছে যেরূপ বোধ হয় অথবা তাহার যে লোকপ্রসিদ্ধ আকৃতি তাঁহার চর্মচক্ষে প্রতিভাত হয় সে সকল বাস্তব ব্যাপার—ফ্যাক্‌ট্‌স্‌ অফ নেচার—সুতরাং সেগুলির সহিত তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। মনোময় পুষ্পকরথে চড়িয়া কল্পনার মুক্ত আকাশে বিচরণ করাই তাহার বিশেষত্ব। জড়জগতে কি ঘটে না ঘটে, কোনটা সম্ভব কোনটা অসম্ভব, এ সকল আদৌ ভারতশিল্পের আলোচ্য বিষয় নহে। শিল্পক্ষেত্রে নেচারকে লইয়া টানা-হ্যাঁচড়া করা ও বিজ্ঞানসর্বস্ব জড়বুদ্ধি প্রধান পাশ্চাত্যজগতেই

সাজে ইত্যাদি। তবে কি আমরা ইহাই বুঝিয়া লইব যে ভারতীয় চিত্র-শিল্পে চিত্রবিজ্ঞানের কোনও স্থান নাই?

ভারতশিল্প অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা "শ্রেষ্ঠ" কিসে? আদর্শের উচ্চতা-বশত? না এই পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রগুলির সৌন্দর্যাধিক্য-বশত? শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ বিচারের প্রণালী কি? কোন বিশেষ সৌন্দর্য ভারতশিল্পের একচেটিয়া সামগ্রী? শুনিতে পাই "আধ্যাত্মিকতা"ই ভারতশিল্পের প্রাণ ও তাহার শ্রেষ্ঠতার কারণ। এই তথাকথিত "আধ্যাত্মিকতা" কিরূপ বস্তু? চিত্রের নায়ক-নায়িকার চোখে মুখে যদি একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল অথবা চারদিকে কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া শিল্পী যদি তন্মধ্যে একটু আলোকের আভাস দিলেন তবেই কি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত হইল? তদুপরি যদি চিত্রে ভাবের অস্পষ্টতা লক্ষিত হয় এবং নায়ক বা নায়িকা যদি এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাঁহাদের অস্থিহীন অঙ্গ-ভঙ্গীর কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়া বসেন তবে তো সোনায় সোহাগা! প্রায়ই তো দেখা যায় শিল্পের মধ্যে জাতীয় ভাব ও প্রকৃতির একটা ছাপ রহিয়াছে। ভারত শিল্পের উপরে যে ভারতীয় ধর্মভাবের একটা ছায়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাতেই কি শিল্পের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল, এবং শিল্প একেবারে "ঐশ্বরিকতার অভিব্যক্তি" হইয়া দাঁড়াইল?

কিন্তু "ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য বাহিরে নয় ভিতরে।" চিত্রের যেটুকু বহিরংশ, যাহা শুধু চোখে দেখা যায়, সেটুকুই তাহার যথাসর্বস্ব নহে। তাহার প্রাণটি, অর্থাৎ শিল্পী তাঁহার হৃদয়ের যে ভাবের দ্বারা তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন সেই ভাবটিই তাহার আসল সৌন্দর্য (যদি ভাবটি চিত্রে বোধগম্য হইয়া থাকে)। শিল্পমাত্রই রেখা বর্ণাদি দ্বারা মনের ভাবকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা। ইহা ভারতশিল্পের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, সকল শিল্পেরই ইহা একটা সাধারণ লক্ষণ। তবে, কেহ সোজাসুজি বক্তব্য বলিয়া যান, কেহ বা তাহাকে কবিত্ব উপমা অলঙ্কারাদি যোগ করিয়া দেন। কেহ প্রকৃতির দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে, কেহ নরনারীর মুখশ্রীতে বর্ণনীয় বিষয় দেখিতে পান, আবার কেহবা কল্পনার স্বপ্নরাজ্য হইতে চিত্রের উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি যে পথেই চলুন না কেন, সকলেরই গুরু নেচার। জগতে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার কোনো অস্তিত্ব নাই। বাস্তবজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই, নেচারকে অবলম্বন করিয়াই, কল্পনাব উৎপত্তি। যাহাকে কল্পনায় ঘর বলিয়া কল্পনা করি তাহার ইট, সুরকি

মালমশলা সবই নেচার হইতে চুরি। এরূপ না হইলে একজনের কল্পনা অপরের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর হইত না।

শিল্পী যে ভাবকে ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাহার সহায়তার জন্য তিনি অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে পারেন এবং নেচার হইতে সংগৃহীত উপাদান-গুলি আবশ্যকমতো গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারেন, ইহা কেহ অস্বীকার করে না। যে রসের অবতারণা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য তাহা যদি চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবেই শিল্পী সাফল্য লাভ করিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু নব্য ভারতশিল্পে সময়-সময়ে অপ্রাসঙ্গিক অদ্ভুত রসের যে প্রাচুর্য দেখা যায় সেগুলিও কি ভারতশিল্পের সাফল্যের নিদর্শন? চিত্র ব্যাখ্যাদিতে ইহার সমর্থনে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, কাব্যে আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, নবদূর্বাদলশ্যাম প্রভৃতি অতিশয়োক্তিতে যখন কেহ আপত্তি করে না তখন চিত্রশিল্পেও এবম্বিধ আতিশয্য কখনোই প্রতিবাদযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু চিত্র ও কাব্যের মধ্যে যে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে সেটাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? কাব্যের "ভাষা" নামক জিনিসটা কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দ বা তৎসূচক চিহ্নাদি দ্বারা ভাব বিনিময়ের একটা সাঙ্কেতিক উপায় মাত্র। কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূলত এরূপ কোনো কৃত্রিমতা নাই। কবি তাঁহার মানসমূর্তিকে ভাষায় বর্ণনা করেন, কিন্তু চিত্রকর সেই মূর্তিকেই চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করেন। কবির পরোক্ষচিত্রে যে অতিশয়োক্তি দূষণীয় বোধ হয় না, শিল্পে "তাহা অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত" হইয়া প্রত্যক্ষ মূর্তি পরিগ্রহ করিলে তাহাকে উদ্ভট ছাড়া আর কি বলা যায়?

কাব্যের ন্যায়, শিল্পেও অলঙ্কার ও উপমার স্থান আছে কিন্তু সেই অলঙ্কার ও উপমা ব্যাপারটাই যখন সর্বেসর্বা হইয়া উঠিতে চায় তখনই আশঙ্কার কথা। বিশেষত কাব্যের কৃত্রিম উপমাপদ্ধতিকেই যখন "উচ্চ-শিল্পের" আদর্শ ধরিয়া লওয়া হয়। আরও ভয়ের কারণ এই যে, ভারত-শিল্পোৎসাহীগণ "আর কোনো সৌন্দর্যের আদর্শ তাহাদের রচনায় স্থান পাইবে না" কেবল এই বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা দস্তুরমতো কোমর বাঁধিয়া ইউরোপীয় শিল্পের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত। ইঁহাদের মতে "ভারতশিল্প" লেবেল যাহাতে আঁটা নাই, তাহা আমাদের আলোচ্য হইতেই পারে না এবং তাহাতে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু থাকা অসম্ভব! যুক্তিস্বরূপ বৈদেশিক ভাষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলা হয় "বিদেশীয়

ভাষায় কাব্য লিখিয়া কে কবে যশস্বী হইয়াছে?” তবে কি এই যুক্তি অনুসারে বিদেশীয় ভাষার চর্চা করাও নিষিদ্ধ হইবে? তাছাড়া দুইটা স্বতন্ত্র ভাষার মধ্যে যে সকল মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, আদর্শ ও উপায়ের আত্যন্তিক অনৈক্য সত্ত্বেও ভিন্ন-ভিন্ন চিত্রশিল্পের মধ্যে এ প্রকার বিভিন্নতা কুত্রাপি লক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, চিত্রের ভাষা মূলত এবং স্বভাবত বিশ্বজনীন।

সৌভাগ্যের বিষয় যাঁহারা হাতে কলমে “ভারতশিল্প কী” তাহা দেখাইতেছেন, তাঁহারা অনেক সময়েই কার্যক্ষেত্রে এই সকল বিচিত্র মতের একান্ত বশ্যতা প্রদর্শন করেন নাই। বেশি কথায় কাজ কি, হ্যাবেল সাহেবের মতে “অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি ইউরোপীয় ও ভারতীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ।” ইহাতে অবনীন্দ্রবাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের অঙ্কিত চিত্রাদির “ভারতীয়ত্ব” কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে কিন্তু তজ্জন্য ঐ সকল চিত্রাদি “খেলো” হইয়া গিয়াছে, আশা করি এরূপ কথা কেহ বলিবেন না। এই জাতীয় অনেক চিত্রেই যে সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়, চিত্রের “ভারতীয়তাই” তাহার একমাত্র বা সর্বপ্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয় না। শিল্পকে যিনি যে ভাবে দেখিতেছেন তিনি সেইভাবে তাহার সাধনা করিবেন। গ্রীকশিল্প বা রোমীয়শিল্প ঐ পথে গিয়াছে অতএব তোমার আমার ও পথে গতির্নাস্তি—এ কোন-দেশীয় যুক্তি? আমাদের আর অন্য গতি নাই, “এই যে ভারতশিল্প-রূপ কল্পতরু, আইস, আমরা ইহারই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পকে মর্তমান দেখাই।” ভারত শিল্প-প্রচারার্থিগণ শিল্পকে যে ভাবে দেখিতেছেন, কেহ যদি ঠিক সে ভাবে না দেখে, তবেই কি তাহাকে “উচ্চশিল্পের” রসগ্রহণে অক্ষম ঠাওরাইতে হইবে? সকল লোকে এক পথে যায় না, সকলের রুচি বা প্রকৃতিও এক নহে। রাফায়েল, রস্কিন, বা শঙ্করাচার্যের দোহাই দিয়া মনকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন এবং সে চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও কম। প্রকৃত শিল্পী অন্তর্নিহিত শিল্পবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই শিল্প-সাধনা করেন। “ভারতীয়” শিল্প “গ্রীক” শিল্প প্রভৃতি নামধারী প্রথা-বিশেষের খাতিরে নহে।

নব্যপন্থী চিত্রকরগণ শিল্পের যে আদর্শ পাইয়াছেন তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুসরণ করিবেন, ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ হইতে পারে না। হয়তো ভাবপ্রধান শিল্পের এরূপ একটা পুনরুত্থান বর্তমান

সময়ে এদেশে বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকিবে। প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বাড়াবাড়ির মাত্রাটাও একটু উৎকট হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা চিকিৎসাটা যেন ভয়ঙ্কর হইয়া না ওঠে। নবশিল্পের শাস্ত্রকারগণ যদি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, কল্পনার দিব্য চশমাটির উপর অত্যধিক মায়াবশত চিত্রবিজ্ঞানের "ঠুলি"টিকে আবর্জনা জ্ঞানে ফেলিয়া দেন, এবং নিজ শিল্পের মধ্যে একটা বিশেষ অনন্যলভ্য "দৈব" সম্পদ কল্পনা করিয়া, "এই আদর্শই সকলের অবশ্য শিরোধার্য" বলিয়া জেদ ধরেন, ও একাধারে বাদী, উকিল, জজ ও জুরি হইয়া যাবতীয় শিল্পের দোষগুণ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন, তবেই ভয় হয় বুঝি বা "অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বুরের" ন্যায় সব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয়।

২

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভারতশিল্প সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তিনি যদি আমার বক্তব্যগুলিকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করিতেন তবে কতকটা সুবিধা হইত। কুসংস্কার ও শ্রদ্ধাহীনতা যে সত্যনির্ণয়ের পক্ষে মস্ত বাধা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমার ধারণা এই যে, শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক ভারতশিল্পের প্রকৃত মর্মোপলব্ধির পথে অর্ধেন্দ্রবাবু প্রমুখ শিল্পোৎসাহীগণের ব্যাখ্যাদিও একটা কম অন্তরায় নহে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপত এই—

১ ভারতশিল্পের আদর্শ ও বিশেষত্ব বিষয়ে ইঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহা খুব সমীচীন বোধ হয় না। যে বস্তুটাকে ইঁহারা "ভারতশিল্প" আখ্যা দিয়াছেন সেটা শিল্পের একটা অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র।

২ উক্ত আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের যে অহি-নকুল সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক এবং প্রকৃতি ও শিল্পের সম্বন্ধ বিষয়ে ভ্রান্তধারণা সম্ভূত। "শিল্প জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব" সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই সকল বিষয়ে একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পজগতের বাজারে ভারতশিল্প বা অপর কোনো শিল্পের দর কিরূপ তাহা জানিবার জন্য আমার কিছুমাত্র ব্যস্ততা নাই। রসেটি, বার্ন জোন্স, স্পেনসার বা বৈষ্ণব কবিদিগের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নাই, সুতরাং বর্তমান আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সদলে হাজির করিবার কারণ বুঝিলাম না। হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণবিদ্বেষী পৌত্তলিক শিল্পের বিরুদ্ধে উদ্যতমুষল কোনো অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রচণ্ড কটাক্ষপাত করিয়াছেন, উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। শিল্পের উৎকর্ষ পরিমাপক কোনো আইন বা আদর্শ মাপকাঠি সম্বন্ধে আমি কোথাও কোনো মত জাহির করি নাই। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছাড়িবেন কেন? তিনি স্বয়ং কতগুলি "উদ্ভট" মত খাড়া করিয়া আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন।

অর্ধেন্দ্রবাবুর মতে পুরাণাদি-বর্ণিত কল্পলোকের বস্তুকল্পনাকে চিত্রে যথাযথ ভাবে (অর্থাৎ 'অক্ষরে অক্ষরে') অনুবাদ করাই ভারতশিল্পের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। উক্ত কল্পনাগুলিকে উদ্ভট জ্ঞানে "ছাঁটিয়া ফেলিবার" প্রস্তাব কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই কিন্তু সত্যসত্যই "পৌরাণিক কল্পলোকে বিচরণ করিবার যাঁহাদের রুচি নাই" সে দুর্ভাগ্যদের অবস্থা কি হইবে? তাঁহাদের পক্ষে কি শিল্পচর্চা নিষিদ্ধ হইবে? বাস্তব জগতে কি "উচ্চশিল্পের" উপযোগী মাল-মশলার কিছু অভাব পড়িয়াছে? প্রকৃতির রাজ্যে যিনি উচ্চ সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, অর্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্পে যদি তাঁহার কোনো স্থান না থাকে, তবে সে শিল্পকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয় বলিতেছেন, 'আজানুলম্বিত' বাহু প্রভৃতি বর্ণনার দ্বারা নায়ককে "উচ্চশ্রেণীর মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, যাহার আদর্শ বাস্তবিক জগতের সাধারণ অবয়বী মানুষের আদর্শ হইতে সর্বথা ভিন্ন।" এই 'আদর্শ' জিনিসটা কোথা হইতে আসিল? এই সকল অতিশয়োক্তি কি কেবলি নিরঙ্কুশ কল্পনা মাত্র? যেটা 'আছে' সেটার সহিত সম্যক পরিচয় না হইলে, যেটা 'হইতে পরিত' বা 'হইলে ভালো হইত' সেটাকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না। অতিপ্রাকৃত ও অবাস্তব আদর্শ বুঝিতে হইলে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা প্রয়োজন, বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতার সহিত পরিচয় আবশ্যক। প্রকৃতির অর্থাৎ

জড়প্রকৃতির ও মানবপ্রকৃতির অপূর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যেই পূর্ণতার আদর্শ ও আইডিয়া নিহিত রহিয়াছে। রিয়ালিজম্ ও আইডিয়ালিজম্, বাস্তব-শিল্প ও ভাবপ্রধান শিল্প, শিল্পের দুইদিক মাত্র। উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকা দূরে থাকুক, একটার সহায়তা ব্যতীত আর একটা কখনো সম্যক সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। রিয়ালিজম্ শিল্পের মূল ভিত্তি, আইডিয়ালিজমে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাহার পূর্ণ সফলতা। অর্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্প যদি পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের সংঘর্ষে আসিলেই আশু শিল্পলীলা সংবরণের আশঙ্কা থাকে, তবে সে শিল্পের রীতিমতো এলোপ্যাথি চিকিৎসা আবশ্যক বুঝিতে হইবে।

গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয় বলিয়াছেন, "রায়মহাশয় চিত্রবিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয় শিল্পের...প্রথা বিশেষ মাত্র।" বিলক্ষণ? "প্রথা বিশেষ মাত্র"ই যদি বুঝিব, তবে তাহাকে "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করিব কেন? অর্ধেন্দ্রবাবুর অভিধানে 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ কি তাহা জানি না, কিন্তু সাধারণ লোকে বিজ্ঞান বলিতে সিস্টেমাটাইজড্ নলেজ বা সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান বুঝিয়া থাকে। চিত্রবিজ্ঞান অর্থে 'যদ্দৃষ্টংতল্লিখিতং' নীতি নহে। অস্থিবিদ্যায় পাণ্ডিত্যকেও চিত্রবিজ্ঞান বলা যায় না। 'মানবজাতির বহুমুখী শিল্পসাধনার' সীমা বা সমষ্টির নামও চিত্রবিজ্ঞান নহে। আলোকবিজ্ঞান (অপ্টিকস্) ও তৎসংক্রান্ত শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সার্বজনীন সত্যের উপর চিত্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। চিত্রবিজ্ঞানকে বুঝিতে হইলে কেবল কতকগুলি 'আইন' করিলে চলিবে না—দৃশ্য সৌন্দর্যের অন্তরালে যে সকল বিচিত্র নিয়ম কার্য করিতেছে "উহার সহিত সহৃদয় সর্বাঙ্গীন পরিচয় আবশ্যক," (ভাব প্রকাশের সহায়তার জন্যই আবশ্যক, অনুকরণ বিদ্যা জাহির করিবার জন্য নহে) অবশ্য বিজ্ঞানই শিল্পরাজ্যের নিয়ন্তা নহে এবং প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের ঘানিতে নিংড়াইলেই খাঁটি শিল্পরস নিস্যন্দিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পের বিজ্ঞানাংশকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বিজ্ঞানের ফ্যাকটস্ ইংরাজের পক্ষে যেরূপ সত্য, অর্ধেন্দ্রবাবুর পক্ষেও তদ্রূপ। শিল্পে কেবল বাস্তব সৌন্দর্যটাই যে সর্বেসর্বা হওয়া উচিত নয়, এ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রাকৃতিক সত্য বিষয়ে অজ্ঞতা বা তৎপ্রকাশে অক্ষমতা একটা খুব উঁচুদরের কৈফিয়ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শিল্প ও প্রকৃতির মধ্যে যখন একটা কৃত্রিম বিরোধ জাগিয়া

ওঠে তখনই শিল্প উৎকেন্দ্র হইয়া কতকগুলি ফ্যাশান, রচনাভঙ্গী ও ভড়ং (ম্যানারিজম্) মাত্রে পর্যবসিত হইতে থাকে। শিল্পের সার্বজনিনতার কথা উঠিলেই এক শ্রেণীর লোকে ভারতশিল্পের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব লোপের অমূলক আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন, এবং "ভারতের শিল্পসাধনার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা কত বড় ধর্ম, কত বড় দায়িত্ব" তাহা বুঝাইবার জন্য অনর্থক আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিয়া তোলেন।

কোনো বস্তু বা ভাব ও তৎসূচক ভাষাগত সঙ্কেতের মধ্যে কোনো সম্পর্ক বা সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। 'পা' এই লিপি বা শব্দটির সহিত শরীরের অবয়ব বিশেষের কোনো সাক্ষাৎ যোগ নাই, একজন বিদেশীর পক্ষে শব্দটা শব্দ মাত্র। লিপিটা আঁচড় মাত্র সুতরাং নিরর্থক। "কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূলত এরূপ কোনো কৃত্রিমতা নাই।" 'পা' বুঝাইতে হইলে 'পা' আঁকিয়া দেখাইতে হইবে। জগতে হাজার-হাজার পা দেখিতে পাই, তাহার কোনো দুটিই একরকম নহে, অথচ সবগুলির মধ্যেই একটা মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে অর্থাৎ সবগুলিই একটা আদর্শ প্যাটার্ন বা ছাঁচের রূপান্তর (ভেরিয়েশন) মাত্র। সকল বস্তুরই প্যাটার্নটিকে বজায় রাখিয়া ভিন্ন-ভিন্ন লোকে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের আদর্শের কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু "আদর্শ ও উপায়ের আত্যান্তিক অনৈক্য সত্ত্বেও" এক শিল্পী 'মানুষ' বুঝাইতে চাহিলে অপর শিল্পীর তৎস্থানে 'হস্তী' বা 'ঢেঁকি' বুঝিবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইহা অবশ্য নিতান্ত স্থূল বিষয়ের কথা হইল কিন্তু মানসিক ভাব বর্ণনের সময়ে কি হইবে? মানসিক অবস্থাকে আমরা সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পাই না। মানুষের মনে দুঃখ, ক্রোধ, হিংসা, ভয় প্রভৃতি ভাবের উদয় হইলে তাহার মুখশ্রী ও শরীরভঙ্গীর যে সকল বিকার লক্ষিত হয়, মানসিক ভাবের ঐ সকল বহিঃপ্রকাশ হইতেই চিত্রে সেই ভাবগুলি ব্যক্ত করিবার সঙ্কেত পাওয়া যায়। অবাস্তব কল্পনা সম্বন্ধেও সেই কথা। অবাস্তবকে কতকগুলি জ্ঞানত বাস্তবের রূপান্তর বা নূতন রকম সমাবেশ রূপেই ('ইন্ টার্মস্ অফ নোন রিয়া-লিটিজ') আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। সুতরাং "অলৌকিক রসের অবতারণা" করিতে হইলে লৌকিকের জ্ঞানটা একটু বিশেষ মাত্রায়ই আবশ্যক। একই বস্তুর অসংখ্য বিচিত্র রূপের মধ্যে হইতে তাহার আদর্শ চেহারা বা মূল ভাবটিকে ধরিবার চেষ্টা হইতেই কন্ভেনশন্-এর উৎপত্তি।

এই কন্‌ভেনশন্‌-এর অর্থ কৃত্রিমতা নহে। কিন্তু অর্ধেন্দ্রবাবু আশ্বাস দিয়াছেন যে "ইংরেজী চিত্রবিজ্ঞানের পাতা উলটাইলেই" দেখিতে পাইব যে "কৃত্রিমতা চিত্রবিজ্ঞানের প্রাণ বা প্রধান সম্পত্তি।" সেই অপরূপ চিত্র-বিজ্ঞানের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায় জানাইলে বাধিত হইব। চিত্রের ভাষার যেখানে উৎপত্তি, যেটা তাহার মূল ভিত্তি, অর্ধেন্দ্রবাবুর ভারত-শিল্প তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন দূরে থাকুক তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও নারাজ। অথচ এদিকে খুব একটা "বিশিষ্ট ভাষায়" আত্মপ্রকাশ করিবার উৎকট চেষ্টাও রহিয়াছে। "ঢাল নাই তলোয়ার নাই খামচা মারেঙ্গে।"

শিল্পে ব্যক্তি এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের স্থান আছে কিন্তু সেটা "মৌলিক ভাষাগত অনৈক্য" নহে—"অলঙ্কার।" রচনাভঙ্গী, আদর্শ ও বক্তব্য বিষয়ের পার্থক্য মাত্র। এই পার্থক্য খুব গুরুতর হইতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় প্রি-র‍্যাফেলাইটগণ যে ভাষার ব্যবহার করেন ইম্প্রেশনিস্টগণও সেই ভাষাই ব্যবহার করেন, প্রকৃতির নিখুঁত নকলনবিশের যে ভাষা নব্য ভারতশিল্পের উদ্ভটতম কল্পনা-নবিশেরও সেই ভাষা। অবশ্য শিল্পকে উপলব্ধি করিতে হইলে শিল্পের আখ্যানবস্তুর সহিত সম্যক পরিচয় আবশ্যক। শিল্পী আলো ও ছায়ার বৈচিত্র্যমূলক কোনো সৌন্দর্যকে চিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু আমার উক্ত বিষয়ক বিদ্যার দৌড়ে হয়তো "গাছের পাতা সবুজ" "আকাশের রঙ নীল" ইত্যাদিবৎ কতকগুলি স্থূল সংস্কার পর্যন্ত। সুতরাং চিত্রবর্ণিত নিতান্ত স্বাভাবিক সত্যটিও আমার নিকট অদ্ভুত প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু অর্ধেন্দ্রবাবু এই ব্যাপার হইতে এই তত্ত্বোদ্ঘাটন করিয়াছেন যে চিত্রের লাইট্‌ এন্ড শেড, আলো ও ছায়া জিনিসটাও একটা কনভেনশন, বা "বিশিষ্ট ভাষা।" এই মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কারের বাহাদুরিটা কাহার জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

5 *The Burden of the Common Man*
The Spirit of Rabindranath Tagore

THE SPIRIT OF RABINDRANATH TAGORE

I SHOULD LIKE TO MAKE IT CLEAR FROM THE BEGINNING THAT I do not propose to attempt a comprehensive survey of the life and works of this illustrious poet ; nor shall I be guilty of the presumption of attempting totally superfluous advertisement of his genius or personality. I shall content myself simply with reproducing, however imperfectly, what I consider to be the right background of thought and environment, for a fruitful study of Rabindranath's poetical works, and with indicating briefly their high value not merely as an effective analysis of present-day problems in India and elsewhere, but as an exposition of the root-problems of life itself.

In the midst of all our work and all our pleasures, we are often unconscious that we are ever carrying with us the burden of an eternal question. Very few of us indeed have anything more than a vague consciousness of its existence, and most of us are satisfied with an occasional mild intellectual interest in the problem. But in some lives—and these lives alone are truly great—the question has assumed an imperative form ; and wherever the demand for an answer has been thus insistent, we have had one of those contributions to human thought that leave a definite impression on the ever-changing ideals of humanity. In this paper we shall deal with some of the forms of which the mystery has revealed itself to-day to a poetic soul who has in his own way sought an answer to the riddle of life.

The present epoch is admittedly a critical period in human history. World-forces, and world currents of thought have been roused to activity and are working away, openly or insidiously, for good or for evil, on a scale hitherto unknown. The commerce of ideas, no less than

the commerce of wealth and industry, is fast weaving the many-coloured threads of human endeavour into one organic whole. Problems of state and politics, problems of society and of religions, are rapidly becoming the common problems of humanity itself. The apparent contradictions of the many-sidedness of humanity, which have for ages provoked the fiercest conflicts between man and man, are slowly subsiding into a truer unity and a more comprehensive harmony, which are all the more profound because of this ruthless disturbance of equilibria and the passionate struggle for a more comprehensive readjustment of life. Humanity, living apart in its own sequestered grooves, armed with the prejudice of conventions and external forms, finds itself called upon to respond to the stimulus of a wider appeal and express itself in terms of a wider sympathy.

We are not concerned here with the final outcome of this struggle, if indeed there can be any finality in its solution. But, seldom, in the self-expression of an individual life, has this ideal of a world-wide rapprochement been sung with such never ending freshness and perfection of harmony as in the poetry and writings of Rabindranath Tagore. The inner growth of the poet's ideal, as clearly reflected in the evolution of his poetry, is so typical of the fundamental laws of the emancipation of thought and of realisation through conflict, that it may almost be taken as a summarised history of the world-wide thought-adjustment through which we are passing at the present moment. The reconciliation of contradictory ideals, the re-construction of apparently anomalous fragments of philosophy, the reconvergence of the a priori idealistic and the objective evolutionary trends of thought, have all been foreshadowed and their battles fought over in the inspired outpourings of the poet's soul.

But first let us take a rapid survey of the various formative influences of tradition and environment that have led

up to the production of his masterpieces—of those literary and intellectual activities that preceded him and paved the way for the advent of his genius.

One of the most fundamental characteristics of the Hindu temperament, in theory at least, is the essential catholicity of its attitude towards the problems of life. In fact, so elastic has it been in its interpretation of religious beliefs and so comprehensive in the diversity of its aims and ideals, that a superficial observer may very easily be induced to believe that Hinduism itself is a mere conglomeration of heterogeneous creeds—and so it is, in fact, when divorced, and considered apart, from its central ideas and the prime sources of its inspiration. Pervading and spiritualising all its aims and ideals is an intense consciousness of the absolute and fundamental unity at the root of all things. From the earliest recognition of the essential oneness of the forces of nature—of the powers that drive the clouds or kindle the fire, of the powers that inspire our thoughts and actions, of the powers that deal with life and death—from the first inspiring glimpse of the one life and one consciousness that pervades the universe—life or matter, body or soul—the whole history of Hindu thought has been a series of onslaughts on everything that has stood in the way of a perfect realisation of this idea. And the whole history of Rabindranath Tagore's poetical career has been, consciously or unconsciously, a crusade against the ever-recurring bondage and tyranny of forms and conventions and sophisticated creeds that hamper the growth of the spirit and deny the self its proper fulfilment in the unfettered attainment of truth.

The Hindu's conception of religion and his logical attitude towards 'religions' should therefore be essentially catholic. To him Dharma, or the Law, is one and eternal, and all the different 'religions' with all their apparent diversities of ideals and practices are but different marga's, or paths, for the ultimate attainment of the same goal.

For, it is Dharma itself, inherent in man, that makes the triumph of Dharma irresistible; it is Dharma itself that drives, lures and guides the soul to inevitable salvation. Mukti, or freedom (which is the Hindu's equivalent for salvation), is the fulfilment of the purpose of existence, and that fulfilment is perfect self-realisation. For therein lies the final solution of all spurious conflict between life and death, between mind and matter, between the soul within and the world without, between 'this', 'that' and 'I'—all merged in one all-pervading, all-inclusive soul in whom each soul discovers its true untrammelled self.

What is this self? How is it to realise itself? What is it that prevents the realisation now? These are the questions we have to face. And yet, somehow, before we seek an answer to them, we require an assurance that we are not following a mere phantom that leads us to nothing. Men have tried all the world over to do without such speculations; men have grown impatient of waiting for an answer to their own inner questionings. So they have proposed to solve the problem of life without any reference to ultimate realities. Thus we have had such conceptions as the 'welfare of society', the 'progress of humanity', the 'greatest good of the greatest number'—which we are invited to accept as the guiding principles of our life and conduct. And yet, when we try to translate such ideas into practice, when we look for some unerring guidance amidst the doubts and trials of our daily lives, we find ourselves asking: What is good? what is progress? what is welfare? And deep down at the bottom of all such queries we find the haunting shadow of the questions we have always tried to suppress: Who am I? what is this life? what is the purpose of my existence?

This Samsara, or procession of phenomena, as the Hindu calls the world, is but the outward expression of the mysterious self-seeking of the soul—a thought-episode of the birthless soul mapped out in time and space. And

all this misery, all this blind helpless groping about, is simply because the soul, having started in its career of self-realisation, forgets its true eternal self and attaches itself to the fleeting things of the world with which it identifies itself. But why is it, it may be asked, that we fail to see all this? Why has the One and Eternal, the Perfect Soul of all souls, in setting free this stream of consciousness that expresses itself through my life, allowed it to lose sight of its true meaning? In asking this question we are really asking why there should be any creation or limited existence at all; why the Perfect should want this elaborate make-believe of imperfections, this incessant striving after a perfection that is already there, this mysterious evolution from the Alone unto the Alone. This is the transcendent mystery of creation, the 'unknowable' of the agnostics, the one missing link in the unending chain of causation; for herein lie the root-problems of thought, of time and space, of consciousness and reality. All that philosophy can do is to give us analogies and supply symbolic conceptions to express rather than explain the nature of the mystery. Self-emancipation is the conquest of maya, the false illusion of self, which gives the semblance of independent reality to all things, and which makes the one indivisible Reality appear as a duality, as subject and object, as mind and matter, as this, that and I. The idea of a fleeting world, the very notion of this life built up of incessant changes, nay, the very act and process of creation itself as we understand it, is a figment of maya. This soul that we worldly-men speak of, this spurious self that finds itself at variance with the world around, this 'I' that toils and suffers and is eternally at the mercy of death, all this is gross maya. And yet, as we are emphatically reminded over and over again, by our illustrious poet, whatever it may or may not be, this maya is, so far as we are concerned, as much a fact, as substantial a reality, as any fact or reality that we deal with in our lives; it is, in fact, the reality of our life and

existence, of our daily round of pleasures and sorrows.

One phase of the Hindu's spiritual endeavour, therefore, is the conquest of maya, which resolves itself into a rigorous process of disabusing the mind of all its preconceived notions of things imbibed from its contact with its environments. "Not this, not this!" I am not this body; I am not this that suffers and dies; I am not this that is rent by passions and blinded by ignorance; I am not this fleeting stream of ceaseless changes. I am the reality of which all this is a shadow; I am the one, the unchanging amidst the changeful many; I am the perfection within myself, beyond sorrows, beyond doubts, beyond death. Such is the way of knowledge, of knowledge through perfection and of perfection through knowledge.

Against the sombre background of this relentless monism which is a direct legacy of premediaeval Vedantic thought, stands the inspiring form of bhakti, or supreme attachment to God. The tendency of this school of love is essentially dualistic, for its whole concern is with the personal aspect of God—God manifest, who expresses himself through the world-process and in the life and struggles of each individual. The general attitude of these two schools of religious thought towards each other is one of mutual distrust and even contempt. But though it is so common to find the advocates of the paths of knowledge and love opposing, and even denouncing, instead of supplementing, each other, it has been pointed out over and over again that there is in reality no inherent conflict between the two. Just as there can be no true knowledge without a supreme passion for it, so there can be no true love, no selfless devotion for anything, without knowledge, without a compelling consciousness that what we love is truly lovable. This conflict of thought, however, has served to emphasise the two-fold nature of the problem, and by insisting on our recognising the immediate as having as important a claim to our attentions as the ultimate, it has

helped to keep in view the practical problems of salvation as distinct (though logically inseparable) from a true conception of it.

Volumes might be written on the Vaishnava cult of love, its mystic traditions, its profound symbolisms, its absorbing ecstasies. The ideal of the Bhakta is love of God for love's sake, without desires, without motives, without any purpose whatever—the mystery of love that he seeks without finding, the compelling love that comes to him unsought. During the 14th century, and for a long time afterwards, the phrase 'Bengali literature' was practically synonymous with Vaishnava poetry, which is all centred round the divine love-story of Radha and Krishna. The story begins with the coming of Krishna into the life and thoughts of Radha. Radha is absorbed in the contemplation of her lover; she lives in the midst of an intense dream in which the personality of her lover is mysteriously woven into all the physical realities surrounding her life. Sometimes he comes across her path and, though he passes away in silence, he always seems to leave a mysterious message behind. And when, at last, the passionate music of his flute is heard calling to her from beyond the river, between joys and fears, between hopes and doubts, Radha knows not what to do. Again and again the music is heard, till, finally, yielding to its insistent call, she leaves all and braves all and goes forth to meet her mysterious lover in the secret bower. This is the story which with various elaborations and embellishment has found widespread acceptance as truly allegorical of the dawning of divine love in the soul.

Such are the twin streams of love and knowledge that have been so exquisitely harmonised and have found such perfect expression in the genius of Rabindranath Tagore. He has been claimed by many of his admirers as a true successor of the Vaishnava poets. His poetry has even been described as an inspired restatement of Vaishnava

thought in the light of his own experience. But that is true only in a strictly limited sense. If we consider, not merely the poetry of a particular period of his life, but the whole of his literary activity, we are driven to the conclusion that Rabindranath is not the slave of any particular school of thought, that he is not the exponent of any particular system or 'ism' and that he is, first and foremost, an exponent of the mystery of life and only incidentally a Vaishnavist or Vedantist, an idealist or realist. In fact, the unfettered evolution of his poetry was possible only through a constant shaking off of the limiting influences of mere tradition and sophisticated life. His temperamental kinship with the early Vaishnava writers, and their lasting formative influence at the early impressionable stage of his poetry, are amply evidenced in the genuinely Vaishnavic inspiration and motif of many of his poems; but he has, nevertheless, succeeded in breaking away most effectively from the tyranny of Vaishnavist literary traditions, and the bulk of his poetry is Vaishnava only in the sense that it is intensely humanistic and deals with the glory and joy of life. Otherwise he is almost as much a Vedantist as a Vaishnavist, for his outlook on the broader questions of life and existence is characterised by an element of rigid and subjective self-analysis that is almost foreign to the Vaishnava writers. This is traceable very largely to the influence of his father, the Maharshi, whose remarkable religious life had been very largely inspired by Vedantic teachings.

The advent of Rabindranath Tagore's poetry happened at that critical moment when Bengali literature, having just recovered from the prolonged depression of a decadent period, was discovering its own potential greatness. For more than two centuries, before the rise of modern Bengali literature about seventy years ago, the whole literature of Bengal had, with rare exceptions, been showing pronounced symptoms of having lost touch with nature. This marked

stagnation of thought was reflected everywhere in the sordid pettiness of literature, in the senseless tyranny of social conventions, in the shallowness of the practical interpretation of religion and philosophy. The noblest birthright of the nation, the priceless legacy of Hindu thought, seemed to have been completely smothered under a virulent growth of morbid parasitic forms and accretions, and all channels of freedom of thought and endeavour were silted up by the choking obstructions of a stagnant, form-ridden, tyrannised and tyrannising society. It was one of those periods in a nation's life when its faculties are dulled by a false feeling of self-satisfaction, when its life is divorced from the ideal, when indolence of thought displaces the genuine toleration of true understanding, when morbid sentimentalism masquerades under the garb of religious devotion, and a tawdry diffusiveness of thought poses as spiritual mysticism. The dormant Hindu intellect, ruminating on the remnants of an ancient and forgotten glory, was in urgent need of an external shock to rouse it and bring it face to face with the demands of an insistent present. And that shock did come at last with the introduction of English education which followed the advent of Rajah Rammohan Ray, the greatest figure in modern Indian history.

The immediate consequence of this English education was the disastrous uprising of a group of reactionaries, violently anti-Hindu and anti-national in attitude. Their openly expressed contempt for the literature and culture, the manners and traditions of their country, acted as a great setback to all literary activities, until the great Vidyasagar and his illustrious colleagues took up the cause and ushered in that memorable period of literary upheaval (from Vidyasagar to Bankimchandra), which came immediately before the present period—the epoch of Rabindranath. One of the longest standing problems in Bengali literature had been the conflict between the academic and

the dialectic forms of the language. Vidyasagar found the language in immediate danger of degenerating into vulgar colloquialism; but his scholarly adherence to its sanskritic form was only a phase in that cycle of movements and countermovements that culminated in the beautiful prose of Bankimchandra and the exquisite language of Rabindranath. Vidyasagar's language was undoubtedly the foundation on which the subsequent literature was based; but the superstructure was radically different in spirit and conception from the formal and prosaic design contemplated in the original plan. The advent of Rabindranath Tagore, with his bold departure from current traditions and originality of invention, was somewhat of a mild shock to the literary orthodoxy of Bengal.

When the foamy and diffusive fancy of an imaginative childhood began to subside and condense into poetical creations, Rabindranath was a mere boy who had barely entered his teens. As was natural, he gave full play to his extravagant imagination, which completely overshadowed all the objective realities surrounding his life. From within his phantasy was evolved a world of dreams coloured with the sombre light of his own restless moods. Leaving aside the very earliest of his poems, which are for the most part merely fanciful, and are noted chiefly for their delightful metrical inventions, we find the whole of his earlier poetry characterised by an intensely self-centred egoism, which is not the comprehensive subjectivity of true self-knowledge, but a mere negation of objective interest in the problems of life. The poet was exploring the intricate mazes of his own restless imagination:

There is a forest called the heart;
Endless, it extends on all sides.
Within its mazes I lost my way,
Where the trees with branches entwined
Nurse the darkness in its bosom.

This aimless wandering and vague hankering after something undefined was in a way characteristic of the literature of the period. In their study of Western literature, says Rabindranath, the writers of that period had found more intoxicant than food. Shakespeare, Milton and Byron had stirred their imagination and disturbed the tranquil flow of literature with a passionateness that aimed, not at the revelation of beauty, but at the sheer luxury of rousing the latent fury of emotional unrest. The essential importance of restraint and of genuine trueness-to-self had no chance of recognition in that turbulent and rebellious atmosphere which is clearly reflected in the defiantly fanciful tone of many of our poet's earlier pieces. This was, however, only a prelude to what was yet to come, and the poet at this stage seems oppressed by a vague, almost morbid, sense of the appalling inadequacy of such a partial outlook on life. This pessimism, however, is not the pessimism of futility, for the singer seems almost to revel in this atmosphere of sadness, as if he were vaguely conscious of being on the threshold of emancipation from the tyranny of this limited self. We venture here to attempt a translation of his poem called 'The Heart's Monody', which is in many ways fairly typical of his muse at this stage ; but no translation can, of course, convey any idea of the wonderful fascination of the style of the original:

What tune is that, my heart, thou singest alone to thyself?
In summer or winter, autumn or spring, day or night,
Restless, persistent,
What tune is that, my heart, thou singest alone to thyself?
Round thee fall the faded leaves and flowers shed their petals,
The dewdrops sparkle on the grass and vanish, the sunlight plays with shadows,

The rains patter on leaves.
And there in the midst of all, thy wasted weary soul
Sings the same, the same, the same unchanging tune.

I wake up from sleep at night
And listen through my heart-beats—
The same voice whispering low,
That knows no rest or pause.
A spirit, sad and weary, sits silent at my doors,
A constant dweller in my heart;
I feel the rhythmic murmur of its breath.
In the hush of mid-day, in my heart's desolate shadow,
A lonely dove sits cooing, making the lone hours mournful,
O my heart! Hast thou learnt naught else
But only one note?
Then cease, cease my heart!
I am weary of the same, the same unchanging cry.

The general trend of these earlier poems will be apparent even from a cursory glance at some of their titles: 'The Suicide of a Star,' 'The Despair of Hope,' 'The Lament of Happiness,' 'Deserted,' 'The Invocation to Sorrow,' 'The Wail of Defeat,' and so on.

The next important stage of evolution is to be seen in the 'Songs of Sunrise,' where the poet, now past his teens, seems suddenly to have discovered himself. The unfolding of the alluring vision of life, the sheer joy of its colours and forms and music, give a definitely positive turn to his verse; and henceforth there is a notable absence of that vagueness and lack of objectivity that characterised his earlier poetry.

I translate here a few lines from one of his poems, 'The Fountain's Awakening,' belonging to this transition stage, which is really allegorical of this inner awakening of

the poet's soul, and his intense longing for a greater measure of the fullness of life.

Out of the morning-songs of birds
One stray note, I know not how, has found its way
into my secret cave to-day.
A trackless ray of the morning sun, I know not how,
Has come to seek its home here within my heart—
And my agelong sleep is over now.
The music of the world has sent its message to me.
Then strike, my heart, strike at the stony prison walls,
Break the bonds of darkness around,
And flood the world with joy.
I hear the call—the call of the distant sea.
The world within its bosom held,
The sea murmurs alone unto itself its own eternal
thoughts.
I long to hear the chant that breaks out from the
unknown deep,
Amid the silence of the listening sky.

The positive impetus of this new-found joy in life is apparent in the immediate change in the trend of the poet's composition. No longer do we hear him sing of mere sorrow and despair and futility, of the dreams and fancies of his fitful moods. But the same directness of an elemental style, the same delightful music of a simple diction, still pervade his poetry. Never before has pure lyrical Bengali expressed itself in poetry more melodious, never before has its feeble pomp or insipid trivialities been resolved into music more refreshing or sonorous. Henceforth begins that long process of emancipation through which the message of the poet and his interpretation of life rapidly transcend the limits of their own intense individualism, and the singer's inborn sense of kinship with nature asserts itself through the widening range of his poetry and his deeper apprecia-

tion of, and keener insight into, the fulness of life. From craftsmanship we see him rising to the heights of true art, and from art, and through art, to that realisation which is the consummation of all art. The gradual evolution through which each trend of thought leads him to the Infinite, the culmination of all the phases of his ideals and inspirations in the breaking down of the barriers of self before the consciousness of one supreme Unity, is all distinctly traceable in the development of his poetry. Over and over again he triumphs over that tendency towards mere abstraction and one-sidedness of thought which has always been a real danger in the portrayal of the Hindu ideal.

The conflicting claims of faith and knowledge, of love and renunciation, of action and detachment, melt away before the supreme assurance of his poetry and the beautiful directness with which he carries us straight to the harmony that sings at the heart of life. What could be nobler or simpler, what more supremely comprehensive than his ideal of nationality, as expressed in his own English prose-rendering (in the Gitanjali)?

Where the mind is without fear and the head is
held high :
Where knowledge is free :
Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls :
Where words come out of the depth of truth :
Where tireless striving stretches its arms towards
Perfection :
Where the clear stream of reason has not lost its
way into the dreary desert sand of dead habit :
Where the mind is led forward by Thee,
into ever-widening thought and action :
Into that heaven of freedom, my Father, let my
country awake !

The keen sense of the Infinite which characterises so much of his verse, may be seen in his poem called 'The Beyond,' of which I attempt the following version.

I am restless,
I am athirst for the great Beyond.
Sitting at my window,
I listen for its tread upon the air, as the day wears on.
My life goes out in longing
For the thrill of its touch.
I am athirst for the great Beyond.
O Beyond! Vast Beyond!
How passionate comes thy clarion call.
I forget, alas! that my hapless self,
Is self confined, with no wings to fly.
I am eager, wistful,
O Beyond, I am a stranger here.
Like hopeless hope never attained
Comes the whisper of thy unceasing call.
In thy message my listening heart
Has found its own, its inmost tongue.
O Beyond, I am a stranger here.
O Beyond, Vast Beyond!
How passionate comes thy clarion call.
I forget, alas! that my hapless self
Has no winged horse on a path unknown
I am distraught,
O Beyond, I am forlorn.
In the languid sunlit hours
In the murmur of leaves, in the dancing shadows,
What vision unfolds before my eyes
Of thee—in the wide blue sky?
O Beyond! Vast Beyond!
How passionate comes thy clarion call.

I forget, alas! that my hapless self
Lives in a house whose gates are closed.

Rabindranath's poems on Death, 'the last fulfilment of life,' written at all stages of his career, are among the most remarkable of his contributions. Here is one taken from the Gitanjali:

On the day when Death will knock at thy door, what wilt thou offer to him?

Oh, I will set before my guest the full vessel of my life—I will never let him go with empty hands.

All the sweet vintage of all my autumn days and summer nights, all the earnings and the gleanings of my busy life will I place before him at the close of my days, when death will knock at my door.

The supreme assurance of the poet, that 'because I love this life I will love Death also,' is characteristic of the tone of his later work. Contrast with this the opposite note struck by the singer in depicting the fear and distrust that is the common attitude of humanity towards death:

'Mother, mother,' we call out to thee, in our terror, if perchance the helpless voice should recall the mother in thee and soothe thy fury. The crushing fear of thy relentless wrath still hopes and pleads with thee.

Where poetry is coextensive with life itself, where art ceases to be the mere expression of an imaginative impulse, it is futile to attempt a comprehensive analysis. Rabindranath's poetry is an echo of the infinite variety of life, of the triumph of love, of the supreme unity of existence, of the joy that abides at the heart of all things. The whole development of his poetry is a sustained glorification of

love. His philosophy of love is an interpretation of the mystery of existence itself. Love, in the form of intrinsic joy, is at once the stability and the dynamic impulse that make up the realities of life—the truest expression of all the forces and all the manifestations of nature. The inner impetus to the world-process is the eternal love waiting to be discovered, and existence itself is the melody of love sustained by the rhythm of its own self-surrendering renunciation. The objective of love is a constantly readjusted incentive—now of a self-centred vanity, now of the youthful visions of life, of 'half a woman half a dream' now the sheer passion of living, now the supreme joy of renunciation, of selfless service. And all this is a natural inborn process of emancipation, the outflowing of life pursuing the shadow of its own perfection and realising itself in the pursuit:

The incense seeks to melt away in fragrance,
The fragrance clings about the incense;
Melody surrenders itself in the rhythm,
  Rhythm strives to lead back to the melody.
The idea seeks expression in the form,
  The form seeks its meaning in the idea;
The limitless abides in the close touch of limits,
  The limits lose themselves in the limitless.
In life and death what mysterious purpose this—
This ceaseless coming and going from the formless
to the form!
Bondage struggles seeking for its freedom;
Freedom longs for a home in the bondage of Love.

THE BURDEN OF THE COMMON MAN

....

THE HISTORY OF HUMANITY HAS ITS WRITTEN PAGES AND ITS unwritten volumes, its flashes of vision and faith and its unending voids of darkness and despair. Trailing vaguely behind the stately procession of its saints and sages, its captains and kings, come the confused masses of straggling humanity, bereft of light and bereft of glory while moments overflow with great realizations, with vision and with idealisms, the epochs proclaims the repeated discovery of the common man—the common man with his colourless life and his aimless gropings, the common man with his unchanging habits and his primitive passions, the common man with his ignoble ambitions and his sordid futilities.

Impatient for the never approaching Millenium, the despairing faith of man cries out from age to age for the vision of heaven on earth and from age to age the echoes ring back the insistent message "Behold the common man!" All protrayals of the Spirit of Humanity in the glorious raiments of its ideas and ideals recall the essential background of common-place realism, of the blank stretches of life filled in with the flesh and blood of Humanity.

Man in his thirst for light and his haunting passion for the life of Faith, breaks away from his fellowmen in impatience and in disgust; and seeks seclusion for his soul away from the world and its distracting riddles. But the cry of the common man is too insistent to be denied. It breaks through the barriers of apathy and blind contempt, it bites into the stone walls of self-contented seclusion, and calls back the wandering Mind of man from the monastery and the wilderness. For, the Common Man is the one outstanding and universal problem in all ages and in all phases of human progress—at once the hope and the dispair

of the prophet and the pioneer. Ever since man's discovery of the glory of his own existence, ever since the first Man wove his dreams into ideas and his ideas into forms, the common man has been there—a living negation of his visions and his dreams. It is this Common Man, this bleakness within Humanity that stamps out the living colours of life from the fairest dreams of Man, and poisons the world with its brute hunger and primitive passions, his feeble pleasures and ignoble sorrows, unrelieved by glimpses beyond. He is the torpid flesh that clothes and smothers the quickened nerves of sentient humanity—the irresponsive deadweight that burdens the progress of evolutions and baffles the soundest logic of the wiseman and the lawgiver. He is the elusive octopus that sucks out the life-blood of living faiths and drags down to itself the noblest inspirations of man. He is the great Unredeemed, the living antithesis of the Millenium—the perpetual cross of humanity, the perpetual symbol of human futility.

All unconscious of his destiny, out of tune and out of measure with himself, he halts and lags behind the marching vanguard of humanity. The dignity of labour and of life—the abiding harmony of all things,—the joy that sings at the heart of creation—have no meanings, no messages for him. He is lost to the sublimest visions of the spirit, lost to the supremest creations of poetry and of Art; to the joyous overflowings of Life pursuing the image of its own perfection and realising itself in the pursuit. He feels no voiceless anguish within himself seeking for expression. Never hearkens and never responds to the mystic call of the spirit, never feels the restless thirst that calls out for something beyond himself. And the floodgates of inspiration are never opened out to him in living tides of joy. He imposes the weary burden of his contemptible struggles on the freshening hopes and buoyant optimisms of humanity. He confronts the radiant faith of man in the fulfilment of life with the dull spectre of his own degra-

dations. Every harmony of life strikes within him some discordant note and the very colours of creation are stained with the drabness of his failures. And from age to age he carries on the despondent gospel of his miserable life.

Men have tried, in all ages and all the world over, to do without this Common Man. They have grown impatient of his feeble response and his feeble faith ; his complacent acceptance of the wretched unblushing Phillistine within him. They have proposed to sponge out this brute in Man from their calculations, and solve the problems of life, of Reality and of salvation, irrespective of his existence. They have fled away from his polluting presence as the embodiment of Maya, they have spurned him and scorned him and held him up to contempt as the apostle of the flesh. They have ruled him out of their lives and thoughts and their dreams of *mukti* or salvation as a regrettable accident of creation and a libellous blot on the fair fame of the creator. The Brahmin and the puritan the pedant and the ascetic, they have all combined to cry down the common man and protect their respective faiths and their personal salvations from the grasps of this pariah. "Who is the Common Man," they ask, "that we should carry the burden of his failures and cripple ourselves for his sake? Why should the primitive unrest of the 'mob' mind be allowed to disturb the rightful tranquility of the righteous? Away with the Common Man: Away with his distracting presence and his pessimisms of futility." But the everpresent common man is not shaken off by refusal ; for, as we strive to avoid his contamination, he seems to grow in bulk and power, co-extensive with humanity itself, menacing the world with his overshadowing presence. And his exclusion from our environments of life and thought becomes a constant and unending process of eliminations. And the belief grows into conviction that the Common Man—the average sinful ignoble unregenerated man is a pestilence of creation.

This rigorous weeding out of the world of self, this deliberate denial of the great mass of its human associations, serves to perpetuate the most fruitless of all dualisms, the dualism between man and man; between the sinner and the saint, the church and the laity, the temporal and the spiritual—the life within and the life without. Religion divorced from life and the arrogant of its isolation, finds itself in needless conflict with the facts of experience, broad-based on unfettered sympathy. It acquires the morbid forms and obsessions of esoteric mysticism or ceremonial purism. It degenerates into the abnormal sin-consciousness of the unhealthy puritan and the scrupulous "don't-touch-ism" of the overconscious Brahmin, it seeks and finds itself in the privileged self-interests of priest-crafts and poperies, and in the shameless exploitation of the unbounded credulity of the common man—"the dumb driven cattle" of Humanity.

And meanwhile, the common man goes along in his heedless way, unconscious of his destiny—unconscious of the glory of existence,—unconscious of the everpresent Reality, of the

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্

The One unchanging amidst the changeful Many, the One sentient amongst all sentient beings. He roams about in his unconscious misery, staining the fair face of humanity with the joyless and passionless gloom of his existence, ever carrying in his person the root problems of life; blindly accepting and blindly rejecting the ministrations of philanthropy and of religion—hankering and clamouring all the time for the gross material satisfactions of life. And ever and again the proud man in his isolated glory awakes to find himself besieged on all sides by the world he had reckoned without, by the spectre of the Common Man grown aggressive in virulence and in power. He finds the common man around him within the prison walls of

the monastery, and the sanctuary of the wilderness—he finds in common man, the brute in man, within himself—unmasked and unashamed! The monasticisms and monopolies of religion, creed bound and scripture bound—the doctrines of spiritual isolation, of the exclusive salvation of the favoured few—are shaken to the core by the onslaughts of the common man. The proud man in his superior wisdom is aroused to the appalling inadequacy of his self-infatuated isolation and finds himself called upon to respond to the stimulus of a wider appeal and express himself in terms of a wider sympathy. He is torn away from his abstractions and his dreams, to face the solemn and relentless realities of life. No longer is the problem of sin a mere abstraction of Theology—it is the living personal problem of the sinful man—a problem that demands a solution. It recalls the sentient man to the immediate problems, as distinct though logically inseparable from the ultimate realities of life.

And the man of visions and ideals comes down in righteous pride or in condescending pity to rediscover the common man—no longer as a pestilence, no longer as a living figment of misdirected creation, but as the human instrument of perfection, as the indispensable "creature of politics, aggregates, rulers and priests." He creates and uncreates his codes of life for him. He feeds him with little fragments of his own ethics and philosophy. He provides him with creeds and with commandments, with the fears of hell and the allurements of heaven. He clothes his own visions of light with clouded obscurities that it may not dazzle the feeble eyesight of the common man. In superior arrogance and in genuine solicitude he brings down the whole atmosphere of his ideas and his ideals shorn of its halos and its glories to the supposed level of the common man's mind. In his anxiety to safeguard him from his doubts and foibles, he surrounds him in advance with the minutest details of life from baptism to burial,

his *sanskar*'s and his *dasakarma* his *mantra*'s and his catechisms, and sophistries and his compromise. And the man of faith and virtues retires confident and satisfied to sleep the contented sleep of the righteous—the common man within him lulled by the assurance of his virtuous labours. Now if all this labour is to be lost, if all this anxious concern and exhaustive care be baffled by the perversity of the common man, if the mere sparks and fragments of faltering light within him should demand a greater allegiance than the reflected diffusions of surer lights, who is to blame for all this? If the uncoiling bondage of the common man is never uncoiled in reality, if crawling eternities are the measures of his march of progress, if perfection be the distant dream of some never attained future, where can salvation be found for the common man!—the living message of despair?

The ages have squandered the richness of its traditions upon him, the noblest birthrights of humanity, and the most priceless legacies of thought are stifled to stagnation by the virulence of his parasitic growth. Olympus comes down to him with its blessings and he drags down Olympus to the depths of his degradation. For him the world is shorn of its light and glory and tainted with the servile shallowness of his indolent thoughts. For him the saints have lived and martyrs died and slaked his thirst in vain with the human blood of sacrifice. For him the Christ Jesus has undergone the sublimest agonies of his Passion. For him the great Bodhisattva sits silent in compassion eternally denying to himself the blessing of salvation, till Heaven has redeemed and reclaimed the last life and soul, the last straggling remnant of the common man. And he goes about unrepenting from age to age—the callous bulk of humanity, ungrateful unreasoning and ever blind.

Such is the common man, the man of sinful sorrows and futile pleasure. And such he remains till the awakening message of some compassionate understanding unfolds

in him the image of his perfection, of the divinity within him. Then the veil of blindness is lifted from his sight, and the common man shakes off the tattered garments of his commonness. In the ecstacy of self discovery the awakened man cries out the gladness of its long silent soul, "Not this! Not this!" I am not this body; I am not this that suffers and dies; I am not this that is rent by passions and blinded by ignorance; I am not this fleeting stream of ceaseless changes. I am the reality of which all this is a shadow; I am the One, the unchanging amidst the changeful Many; I am the perfection within myself beyond sorrow, beyond doubts, beyond death.

The path of evolution is nowhere a straight line of progress. It is a ceaseless branching-out of the eternal flux of life seeking and finding its appropriate forms and expressions, or perishing in the attempt. And this is as true of the evolution of ideas and thoughts as of the biological laws of progress. The problems of life admit no static finality in their solutions, but demand a constant and active readjustment of ideas and relations. One simple vision, one simple germ of an inspiring idea, works out its age-long evolution in a whole world of struggle and adjustments. Moments expand to eternities, generations come and generations go, experience fades into memory and memories crumble away in the dead bones of history while man struggles with his self evolution and the vision of his real self "as he is in himself in his own rights." Critics and exponents arise and fight about experiences and their interpretations, about words and their meanings, about principles and their applications. Thoughts arise to refute thoughts, lives to challenge lives, and ever and again amidst the revolving strifes the common man loses his gospel of salvation, his sublime vision of liberty—and drifts back to his haunted life of oblivious habits. Habits good and bad, habits of indolence and of passion, habits vicious and pious, but all mere habits and bondage none the less. Reason

and Democracy, Liberty, Equality and Fraternity—the words remain only to shed their meanings, the struggles go on without their significance and the very impulses of life are left to stagnate in the "dreary desert sand of dead habit." And the cycle goes on from life to life. In his recurring blindness the common man loses the consciousness and looks about for some external stimulus to rekindle the life of faith within him. Stupendous indeed is the burden of the common Man—the crushing burden of sins and sorrows that he carries in the world. The man of faith has the strength of his inner light, the solace of his visions and his ideals. To him is revealed the life that sustains and the glories that light up his struggles and his aspirations. But the common man is bereft of the light divine and the blessed visions of beatitude. He is the Simon of Cyrene who bears the cross of the eternal Christ. He carries within him the agonies of atonement—blind mute and unquestioning. History raises its monuments of glory to her illustrious sons but he the common man, the true image of suffering humanity is the dust and the earth of which monuments are made. He is the pain spot in man that fills the life of man with its aching throbs.

"Blessed is the Common Man for in him is the image of perfection—the perfection that waits not for the dim distant future but is eternally realized in his divinity. Not merely the ultimate triumph of *dharma* that drives, lures and guides the soul to inevitable salvation, but of the ever-present triumph of all things, of the meanest of God's creations. As immortal Whitman sings "Illustrious everyone! Illustrious what we name space, spheres of unnumbered spirits. Illustrious the mystery of motion in all beings. Illustrious the senses, the body. Illustrious the passing light. Illustrious whatever I see or hear or touch to the last Good in all, even the last particle. O amazement of things! O spirituality of things! I sing to the last equalities modern or old. I say Nature continues, glory con-

tinues. For I do not see one imperfection in the Universe. Nor one cause or result lamentable at last. Of life immense in passion pulse and power cheerful, for freest action formed under the laws divine. The Modern Man I sing"—The common man. The world was never more perfect than it is today and never will be so. Life proceeds from perfection to perfection, from reality to reality—each moment each phase of life, perfect in its place, perfect in its relation to all things, perfect in its promise and its fulfilment. The Millenium may never arrive, Utopia may lose itself in the mazes of its conception, but the fulfilment of man is eternally written. The image of that perfect fulfilment he carries within and spreads without—the image of the divinity in the common man.

But why then, all this misery, all this blind helpless groping about, this incessant and aimless striving after a perfection that is already there? this elaborate make belief of imperfection. Philosophy is hushed into silence but the vision of faith sings out in eloquent joy. Today the common man has found himself, the common man has found his gospel. He may lose it again in the blinding conflicts of passion—in the false clashings of spurious cause. But the great fact is that he has "positively appeared—that is enough." He has found himself not merely in fragments of the faltering present, not merely in the vague memories of his personal past but in the flashes of comprehensive vision of the advancing future calling out to the perfection within him to bear witness unto itself.

Come leaders of lost causes! Come Messengers of forlorn hopes! Come torch-bearers of flickering faiths! For the common man is awake today—awake in all his glory and all his Divinity—half a brute and half a man, but all divine. He is awake and thirsting for a living faith for himself, a living faith in himself. Through the ages of darkness and despair he has been awaking in the majesty of consciousness and the fullness of power. And now he

is awake with his hopes and his aspirations, his passions and his promises of peace. All the messages of man, all the agelong gospels of hope and of liberty have reached down to the living depths within the common man—through endless tortures and denials, through the agonies of cataclysms. The common man is at your doors working away for good or for evil, for life or for death the problems of his own salvation. Still blind, still groping, still helpless but in deadliest earnestness, creating and discovering he knows not what. With blind faith he clings to his monstrous 'isms' and his impossible creeds, all unconscious of the unfolding future. He is out for the quest of the Holy grail, of his Heaven in earth.

And in the midst of all this is the silent and eternal God of creation in the transcendent glory of his Love, waiting to be discovered. That unfolding love, that intrinsic joy, is at once the stability and the dynamic impulse that make up the realities of life—the final expression of all the forces and all the manifestations of nature. The inner impetus to the world process is the melody of this joy of love sustained by the rhythm of its own self surrendering renunciation. The objective of the common man's life may be a shifting and constantly adjusted incentive—now of self-centred vanity, now of the youthful visions of love, of "half a woman half a dream," now the sheer passion of living, now the supreme joy of renunciation, of selfless service. But all this is a natural inborn process of emancipation, the outflowing of life pursuing the shadow of its perfection and realizing itself in this pursuit.

হ-য-ব-র-ল আর আবোল-তাবোল-এর অনাবিল হাস্যোচ্ছ্বাস নিয়েই আমরা চমৎকৃত আছি। কিন্তু গদ্যেপদ্যে সেই সব অভাবনীয় অসংলগ্নতার কারিগর সুকুমার রায় ছিলেন বিজ্ঞানের একজন খুবই মেধাবী ছাত্র। বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং সাহিত্যবোধ—দুয়ের মিলনে ব্যঙ্গরসিকতার উৎকৃষ্ট গল্পকবিতা ছাড়া, তিনি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধও লিখেছিলেন। একদিকে যেমন চিন্তার বাহন ভাষার সঙ্গে চিন্তার যোগ, শিল্পে-ধর্মে-বিজ্ঞানে চিরন্তন জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞান আর দৈবের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আছে, তেমনি শিল্পে অত্যুক্তির স্থান কিংবা ভারতীয় চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়েও তিনি চিন্তিত। ভাবে ভাষায় মিলে প্রবন্ধগুলিতে যে আশ্চর্য আধুনিকতা আছে, পাঠককে তা পুনরায় এই স্মরণীয় লেখক সম্পর্কে চমৎকৃত করবে।

বর্ণমালাতত্ত্ব নামে ছন্দোবন্ধ একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ এবং তাঁর দুটি ইংরেজী রচনাও এই সংকলনের অন্তর্গত হয়েছে। গ্রন্থাকারে এই সব রচনা এই প্রথম প্রকাশিত হল।